Contents

পীরতন্ত্রের আজব লীলা

তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

পীরতন্ত্রের আজব লীলা

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩০[illegible]৩২৫

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

পীরতন্ত্রের আজব লীলা

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৮৪ বাংলা
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০২ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪১২ বাংলা
মহররম ১৪২৭ হিজরী

মূল্য ঃ ৫০/= টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

দু'টি কথা

একটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার নোট হাতে এলে কত ভাল লাগে। তাকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু ঐ নোটটাই হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে কিছুদিন পর অপরিষ্কার ও জরাজীর্ণ অবস্থায় হাতে এলে আমরা বলি এটা বদলে দেন। বলাবাহুল্য, ইসলামের অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে। যে ইসলামের সৌন্দর্যে ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেই ইসলামের নামে এখন মানুষ নাক সিটকাচ্ছে। তার একমাত্র কারণ– শির্ক, বিদআত ও ইসলাম বিরোধী আবর্জনার দ্বারা ইসলামের অরিজিনাল সৌন্দর্যকে আমরা ম্লান করে দিয়েছি। শির্ক এখন তাওহীদের আসন অধিকার করেছে, বিদআত এখন সুন্নাতের আসন অধিকার করেছে। ইসলামের গা থেকে মেজে-ঘষে ঐ আবর্জনাগুলোকে উঠিয়ে দিতে না পারলে ইসলামের সাবেক সৌন্দর্য ফিরে আসবে না।

যে ইসলাম শতধা-বিচ্ছিন্ন মানুষকে এক প্লাটফরমে এনেছিল, তথাকথিত পীরতন্ত্র সেই ইউনিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। পীর বা পুরোহিততন্ত্র, কবরপূজা, মানুষ হয়ে মানুষকে সিজদা করা প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী আবর্জনায় ইসলাম আজ কলুষিত হয়ে পড়েছে। আমি এই কলুষতার বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ করেছি। আমি জানি, এতে অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগবে এবং তজ্জন্য আমাকে অনেক কটুকথাও শুনতে হবে। কিন্তু করবো কি? হক কথা প্রচার না করলে আল্লাহর কাছে যে জবাবদিহীর প্রশ্ন রয়েছে।

গ্রন্থকার

১লা রামাযান, ১৩৯৭ হিজরী

সূচীপত্র

১। পীর শব্দের তাৎপর্য ৫
২। পীরদের দাবী ৬
৩। পীরদের দাবী ঠিক নয় ৭
৪। ওসীলা হওয়ার দাবীও ভিত্তিহীন ৯
৫। মূর্খ পীর ১৪
৬। পীর বংশ ১৫
৭। বিনা পুঁজির ব্যবসা ১৬
৮। ভণ্ড পীরদের কীর্তিকাণ্ড ১৯
৯। ভণ্ড পীরের কারামতি ২৪
১০। আল্লাহর ওলীদের কারামতি ২৯
১১। ভক্তি যেখানে অন্ধ ৩১
১২। পীরদের আউট বুদ্ধি ৩৬
১৩। পীরদের সিজদার দাবী ৪৪
১৪। যিকিরের রহস্য ৪৬
১৫। পীর-মুরীদির কল্যাণে কবর পূজা ৫২
১৬। পীররা শির্কের প্রশ্রয় দিচ্ছেন ৬৫
১৭। কাল্পনিক পীরের ছড়াছড়ি ৬৭
১৮। পীরতন্ত্র মানুষকে 'গওস' বানিয়েছে ৭২
১৯। সব পীরের এক বুলি ৭৪
২০। শেষ কথা ৭৬

পীরতন্ত্রের আজবলীলা

পীর শব্দের তাৎপর্য

যে পীর পীর করে আমরা এতো পাগল, সেই পীর শব্দটা কিন্তু আরবী শব্দ নয়। আর ওটা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিভাষারও কোন শব্দ নয়। পীর শব্দটা ফারসী শব্দ। মানুষের বয়স বেশী হয়ে গেলে সেই বুড়োবুড়ি মানুষকে বলা হয় পীর। পারস্যের অগ্নি পূজারীদের পুরোহিতকে বলা হয় 'পীরে মুগাঁ'। ফারসী অভিধানে 'পীরে মুগাঁর' অর্থ করা হয়েছে– 'আতাশ পোরস্তুঁকা মুরশেদ' অগ্নি পূজারীদের পুরোহিত। মদের আড্ডায় যিনি মদ বিক্রয় করেন, সেই শুঁড়ি মহাশয়কে বলা হয় পীরে মুগাঁ। মুসলমানদের কোন ইমাম, খতীব, নায়েবে নবী বা নেতার শানে এই পীর শব্দটাকে ব্যবহার করতে হবে, এ প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে মিলে না। তবে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকভাবে মদরূপে অভিহিত করে, সেই প্রেমরস পরিবেশনকারীকে পীরে মুগাঁ বা শুঁড়ি মশায় বলে অভিহিত করেছেন যেমন ঃ

বমায়ে শাজ্জাদাহ্ রঙ্গীন কুন	بمائے سجادہ رنگین کن
গিরাত পীরে মুগাঁ গোয়াদ	غیرت پیرے موگاں گوید
সে সালেক বেখবর নাবুদ	سے سالك بے خبر نہ بود
যে রাহে রাস্মো মান্যালহা।	جے راھے رسمو منزلھا

পীর মুগাঁ অর্থাৎ শুঁড়ি মশায় যদি বলেন, তাহলে তুমি জায়নামাযকে মদের দ্বারা রাঙিয়ে তুলো। কেননা পথের সন্ধান গুরুজী ভালভাবেই অবগত আছেন। এই কবিতার শুঁড়ি মশায়কে 'পীরে মুগাঁ' বলা হয়েছে।

খৃষ্টানদের Priest আর হিন্দুদের পুরোহিত বলতে যা বুঝায়, পীর বলতে ঠিক তাই বুঝায়। পীর পুরোহিত বা Priest এর কোন প্রতিশব্দ কুরআন হাদীসে নেই। আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী (রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণও কেউ

কোনদিন পীর বলে দাবী করেননি। তাবিয়ীনদের যুগে পীরের অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ (রহ.) প্রভৃতি মহামতি ইমামগণও পীরগিরি করেননি। কোন্ কুক্ষণে পারস্যের অগ্নি পূজারীদের সেই পীর তওহীদবাদী মুসলিম সমাজের ঘাড়ে-গর্দানে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল- তা ভেবে কুল পাওয়া যায় না।

আরবী ভাষায় উসতায ও নেতাকে শাইখ বলা হয়। পীরি-মুরীদির শাস্ত্রে কেউ কেউ এ শাইখ শব্দটাকে পারস্যের অগ্নি পূজারীদের পীরের সমঅর্থবোধক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তওহীদবাদী মুসলমানদের উসতায ও নেতাকে আর অগ্নি পূজকদের পুরোহিতকে এক গোয়ালে পুরে দেয়া কেমন করে হালাল হয়ে গেল– বুঝলাম না।

পীরদের দাবী

আমাদের দেশে নানা ধরনের পীর দেখা যায়। সব পীরের যে দাবী এক– তা নয়। তবে অধিকাংশ পীরের দাবী হচ্ছে ঠিক হিন্দুদের পুরোহিতদের মতই। পুরোহিত ও যাজকরা সব সময় হিন্দু জাতির সামনে থাকেন। পূজা-পার্বন, যাগ-যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির একচেটিয়া মালিক তারাই। তারা ছাড়া এ সবের অধিকার আর কারো নেই। তারা মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার মাঝে মাধ্যম বা 'ওসীলা' স্বরূপ। সৃষ্টিকর্তার কাছে সরাসরি মানুষ যেতে পারে না, তাই এ 'Edditional God' এর কাছে তাদেরকে যেতে হয়। পুরোহিত না হলে পূজা অর্চনা হয় না, মনের বাসনা পুরা হয়না, পাপমুক্ত হওয়া যায় না। পুরোহিত বা 'Edditional God' যার আছে তার সবই আছে, আর যার পুরোহিত নেই তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। এই পুরোহিতরাই গুরুদেব নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। কারণ মন্ত্র পড়ান এই গুরুদেব, শিক্ষা দেন এই গুরুদেব, ভক্তের পাপমোচন করে দেন এই গুরুদেব, ভক্তের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এই গুরুদেব। ভক্ত শত অপরাধে অপরাধী হোক, শম্ভু হয়ে তার শত অপরাধ নাশ করে দিয়ে স্বয়ং ভগবানকে দেখিয়ে দেন এই গুরুদেব।

বলাবাহুল্য, পুরোহিত তন্ত্র বা গুরুবাদ হিন্দু সমাজের যে অবস্থা ঘটিয়েছে, পীরতন্ত্র ঠিক সেরূপ মুসলিম সমাজের অবস্থা ঘটিয়েছে। কারণ পীরের দাবী পুরোহিতদের দাবীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পীররাও বান্দা আর আল্লাহর মাঝখানে নিজেদেরকে মাধ্যম বা 'ওসীলা' বলে দাবী করেন। তাঁর মুরিদ-মুরীদ্‌নি বানান; তাঁরা ভক্তদের গোনাহ্‌খাতা নাশ করে পাপমুক্ত করেন, তাঁদের অনেকেই পরকালে মুরীদদেরকে বেহেশতে পৌঁছে দেয়ার 'গ্যারান্টি' দিয়ে থাকেন; অনেকে আবার ভক্তদেরকে আল্লাহর সঙ্গে দেখাও করিয়ে দেন; ইসমাঈলিয়াদের পীর আগাখান তো এখানে বসেই বেহেশতের পাসপোর্ট ভিসা দিয়ে থাকেন। তাহলে এখানে পুরোহিত ও পীর সবাই যে একই পথের পথিক তাতে আর সন্দেহ থাকলো কোথায়?

পীরদের দাবী ঠিক নয়

ইসলামী শারা শরীয়ত মতে পীর পুরোহিতদের দাবীগুলো ঠিক নয়। কারণ মানুষের পাপমোচন করার অধিকার কোন পীরকে দেয়া হয়নি। পাপ নাশ করার শক্তি কোন মানুষের নেই, কোন ফেরেশতার নেই, কোন জ্বিনের নেই, কোন ওলী-দরবেশের নেই। পাপমোচনের একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহ। সূরা আলে-ইমরানের ১৩৫ আয়াতে আছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ... *

"কোন ঈমানদার মুসলমান যখন কোন পাপ কাজ করে বসে, তখন তারা আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চায়, কেননা আল্লাহ ছাড়া গোনাহ্ খাতা মাফ কে করতে পারে?"

اسکو درجے کو پہنچ سکتے نہی غوس و کتب
زندگی میں جسنے پائی صحبت خیر الورا

উস্‌কে দার্‌জে কো পুহুঁচ্ সাক্‌তে নেহী গওস্ ও কুতুব
জিন্দেগী মে জিস্‌নে পায়ী সহবতে খায়রুল ওরা।

জীবনে যাঁরা প্রিয় রসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তথাকথিত গওস্ ও কুতুবরা তাঁদের দরজায় পৌঁছতে পারে না। এহেন মহাসম্মানিত নিজের রসূলকেও আল্লাহ তা'আলা পাপমোচনের অধিকার দেননি। সূরা আন-নিসার ৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا *

"পাপীরা যদি রসূলের কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর রসূলও যদি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আল্লাহকে তারা ক্ষমাশীল করুণাময়রূপে পাবে।"

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, পাপমুক্ত করার শক্তি রসূলকে দেয়া হয়নি। এবার হিদায়াত করার কথা। হিদায়াত করার শক্তি পীরতো দূরের কথা, আল্লাহর রসূলও পাননি। সূরা আল-কাসাসের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন–

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ *

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।"

মোট কথা পাপমোচনের দাবীও পীর সাহেবদের মিথ্যা, আর হিদায়াত করার দাবীও পীর সাহেবদের অমূলক। কোন কোন পীর সাহেব ভক্তদের পাপের বোঝা বহন করবেন বলে সান্ত্বনা বা 'গ্যারান্টি' দিয়ে থাকেন। তাঁদের এ দাবীও পীরগিরি বহাল রাখার এক ফন্দি ছাড়া আর কিছু না।

কুরআনে সূরা আন্‌কাবূত ১২ নং আয়াতে আছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ *

"কাফিররা মুমিনদেরকে বলতো আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। কিন্তু তারা তাদের একটুমাত্র বোঝাও বহন করার শক্তি রাখে না; তারা মিথ্যুক, তারা ধোঁকাবাজ।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে পাওয়া যায়, আল্লাহর রসূল ﷺ নিজের বংশের সকলকে আর বিশেষ করে আপন চাচা আব্বাস (রাযি.)-কে, আপন ফুফু সুফিয়া (রাযি.)-কে ও আপন মেয়ে ফাতিমা (রাযি.)-কে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। কেননা তোমাদেরকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনই কাজে লাগব না। হে বেটি ফাতিমা! এখন আমার মাল থেকে যা ইচ্ছে নিতে পার, কিন্তু জেনে রাখ আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনই কাজে লাগব না।

পাঠক এখানে লক্ষ্য করুন– যিনি সৃষ্টির সেরা, যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, সেই প্রিয় রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ যদি কিয়ামতের দিন নিজের মেয়ে ফাতিমার দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহলে কোন্ সাহসে এক শ্রেণীর পীর-নামধারী গুরুদেব কিয়ামতের মাঠে ভক্তদের পাপের বোঝা বহন করার স্পর্ধা দেখাতে পারে বুঝতে পারি না।

ওসীলা হওয়ার দাবীও ভিত্তিহীন

পীরদের আর এক দাবী হল, তাঁরা জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, আদালতে ইষ্ট সিদ্ধির জন্য যেমন উকিল মোক্তারের দরকার, ঠিক তেমনি তোমরা সংসারের ক্ষুদ্র কীট, সরাসরি আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আল্লাহর কাছে যেতে গেলে ওসীলা বা মাধ্যম তোমাদেরকে ধরতেই হবে, আর সেই মাধ্যম বা উকিল মোক্তার হচ্ছি আমরা এই পীরের দল।

পীরদের এ দাবীও ভিত্তিহীন। কারণ যে আল্লাহ প্রেমময়-বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থলের যাবতীয় খবর রাখেন, যে আল্লাহ বান্দার আকুল ফরিয়াদ সরাসরি শ্রবণ করতে সক্ষম, সেই আল্লাহকে দুনিয়ার সংকীর্ণ দৃষ্টি, সসীম জ্ঞান, একেবারে অক্ষম বিচারকদের সাথে তুলনা করে পীরদের উকিল মোক্তার সাজার দাবীটা শির্ক ছাড়া আর কি হতে পারে?

এদের সম্পর্কে কুরআনের সূরা ইউনুসের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

'তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজায় লিপ্ত রয়েছে, তারা তাদের লাভ ও ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, আর এই অপকর্মের কৈফিয়ত স্বরূপ তারা বলে থাকে, ওরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী মাত্র।'

কুরআনে সূরা আয্-যুমারের তৃতীয় আয়াতে বর্ণিত আছে–

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى... *

"উপাসনাকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কর। যারা আল্লাহকে ছেড়ে আরও পৃষ্ঠপোষকের দল গ্রহণ করেছে, তারা বলে থাকে আমরা ওদের পূজা অর্চনা শুধু এই আশাতে করি যে, তারা 'ওসীলা' হয়ে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে।"

কোন কোন পীরভক্ত হয়তো এখানে বলবেন, মুরীদরা কি পীরের পূজা উপাসনা করে নাকি? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন আদি বিনে হাতিম আল্লাহর রসূল ﷺ -কে করেছিলেন। একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ কুরআনের সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতটি পাঠ করছিলেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ *

"ইয়াহুদী আর খৃষ্টানরা তাদের পণ্ডিত পুরোহিতদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।"

এমন সময় খৃষ্টান পণ্ডিত আদি বিনে হাতিম সেখানে হাজির হয়ে বললেন, কই আমরা তো তাদের পূজা অর্চনা করি না। আল্লাহর রসূল ﷺ তখন বললেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, সেগুলোকে যদি তারা হারাম বলে ঘোষণা

করে, তাহলে তোমরা কি সেই হালালকে হারাম বলে গ্রহণ কর না? আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সেগুলোকে যদি তারা হালাল বলে ফতোয়া দেয়, তাহলে তোমরা কি সেই হারামকে হালাল বলে স্বীকার কর না? আদি বললেন, জী হাঁ। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এটাই হচ্ছে তাদের পূজা অর্চনা করা। (ইবনু জারীর)

মোটকথা, আল্লাহ কোন মানুষকে পাপমুক্ত করার শক্তি, হিদায়াত করার শক্তি, দেহ ও মনের পবিত্রতা সাধন করার শক্তি পাপের বোঝা বহন করার শক্তি এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে উকালতি করার শক্তি দেননি। এখন যদি কেউ বলে, মানুষ মেরেছি, দুর্নীতি করেছি, গুণ্ডামী করেছি, লাখ লাখ টাকা আত্মাসাৎ করেছি, গাড়ি বাড়ি করেছি, পর্বত প্রমাণ গুনাহ্‌র বোঝা হয়েছে, চতুর্দিক অন্ধকার। আমাকে বাঁচাবে কে– আমার ঐ পীর; আমাকে হিদায়াত করবে কে– আমার ঐ পীর; উকালতি করবে কে– আমার ঐ পীর। তাহলে এটাই হবে পীরের পূজা করা।

পূর্বেই বলেছি, পীর বা পুরোহিতের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলমান স্বয়ং তার পুরোহিত। প্রত্যেক মুসলমানকে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেছেন– 'রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যেমন মধ্যস্থ ধরা হয়, তেমনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ ধরা হারাম। যারা কাফির, মুশরিক এবং বিদআতী, তাদের ধারণা রাজা আর প্রজাদের মধ্যে যেমন আড়াল বা ব্যবধান থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে আড়াল বা ব্যবধান আছে। যারা সাধারণ মানুষ, হিদায়াতের ব্যাপারে, রুযী-রোজগারের ব্যাপারে বা অন্যান্য দরকারী ব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর কাছে আবেদন জানানোর অধিকার তাদের নেই, কাজেই মাঝখানে একটা মধ্যস্থের দরকার। এই মধ্যস্থের মাধ্যমেই তাদেরকে প্রার্থনা জানাতে হবে। তারা আরও মনে করে, এই মাধ্যমের মারফতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে হিদায়াত করে থাকেন ও রুযী-রোজগারের বিতরণ করে থাকেন। অতএব সাধারণ লোক এই মধ্যস্থদের কাছে আকুল ফরিয়াদ জানাবে আর মধ্যস্থগণ তাদের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে, যেমন রাজার পরিষদরা রাজার সান্নিধ্য লাভ করার দরুন তাদের কথা যেমন রাজার

কাছে অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি এই পীর ফকিরের দল মধ্যস্থরূপে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছে বলে তাদের সুপারিশ ও আল্লাহর কাছে অত্যধিক কার্যকরী হবে, এরূপ ধারণা নিয়ে কোন ব্যক্তি কাউকে পীর, মুর্শেদ, গুরু বা পুরোহিত যে নামেই হোক না কেন, মধ্যস্থ মান্য করলে সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে। তাদের তাওবাহ্ করা ওয়াজিব। (রাসায়েলে সুগ্‌রা)

ইবনু তাইমিয়ার এই মন্তব্যের পর কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْسَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর 'ওসীলা' অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, তাহলে তোমরা পরিত্রাণ পাবে।"

এই আয়াতের মাঝে যে 'ওসীলা' শব্দ আছে, পীর সাহেবরা বলছেন, এই ওসীলার তাৎপর্য হচ্ছে মাধ্যম। তাঁরা 'ওয়াব্ তাগু ইলাইহিল ওসীলা'র অর্থ করেছেন 'আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য ওসীলা বানাও'। পীর সাহেবরা জোর দাবী করে বলছেন, আমরা সেই ওসীলা। আমাদেরকে না ধরলে তোমাদের রক্ষা নেই। আর মুরীদরাও এই ওসীলাকে ঠেলে নিয়ে যেয়ে পীরপূজা ও কবরপূজায় রূপ দিয়ে দিয়েছে। তারা বলে–

شیئا لله چوں غداء ے مستمند
ال مدد خاهم جے خاجا نقش بند

'শায়আন লিল্লাহ চুঁ গাদায়ে মুস্‌তামান্দ
আল্‌মদদ খাহাম যেখাজা নক্‌শ বন্দ।'

আমি নেহায়েত বাধ্য ও অভাবগ্রস্থ হয়ে নক্‌শ বন্দ সাহেবের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাচ্ছি।

পাঠকগণ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। যেখানে দাবী করা হচ্ছে ঐ সব বুজরুগ পীররা আমাদের ওসীলা। ওদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে ওদের মাধ্যমে দিবেন, কারণ আল্লাহই

হচ্ছেন আসল কর্তা। কিন্তু হয়ে গেল তার উল্টা। নক্‌শ বন্দ সাহেবকে ওসীলা না বানিয়ে ওসীলা বানানো হল আল্লাহকে। 'শায়আন লিল্লাহ, অর্থাৎ হে বুজ্‌রুগ, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিন। এ কথার দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, আসল দেনেওয়ালা এ পীর আর আল্লাহ হলেন ওসীলা। কি তাআজ্জুব ব্যাপার।

যাক, এখন কথা হচ্ছে, 'ওয়াব্ তাগু ইলাইহিল ওসীলা'র নৈকট্য লাভ করতে হলে কুরআন হাদীস মোতাবেক আল্লাহর দ্বারা আল্লাহ একথা আমাদের বলেননি যে, তোমরা পীর ধর।' ওসীলা শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 'নৈকট্য'। আর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর দ্বারাই করতে হবে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী এর অর্থ করেছেন– 'আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। কামুস নামক বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'বাদশাহ বা মহান আল্লাহর নৈকট্যের নাম ওসীলা।' কুরআনের ভাষ্যকারগণ সমবেতভাবে ওসীলার অর্থ 'নৈকট্য' বলে উল্লেখ করেছেন। তফসীর জালালায়িনে 'ওয়াব্‌তাগু ইলাইহিল ওসীলা'র মানে করা হয়েছে– 'ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর।' তফসীর জামেউল বয়ানে ওসীলার অর্থে বলা হয়েছে– 'ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করা।' তফসীর খাযেনে ওসীলার তাৎপর্যে বলা হয়েছে– ইবাদত ও সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। তফসীর মাদারিকে 'ওসীলা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'ওসীলা' ঐ কাজের নাম যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। তফসীর ফতহুল বয়ানে বলা হয়েছে– 'ওসীলা' আল্লাহর নৈকট্যের নাম। হাফেয ইবনু কাসীর বলেছেন– 'আল্লাহর নৈকট্যের নাম যে 'ওসীলা' এ বিষয়ে কুরআনের ভাষ্যকারদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তফসীর কাবীরে বলা হয়েছে– 'ওসীলা' ওরই নাম, যার সাহায্যে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারা যায়। এই ওসীলার উদ্দেশ্য– ঐ ওসীলা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কাজে লাগে। এ ওসীলা ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত।

মোটকথা সমস্ত অভিধান ও তফসীরের কিতাব থেকে এ কথাই জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা ঐসব ইবাদত ও সৎকর্মের নাম, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়। আল্লাহকে পেতে হলে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে, সৎকর্মের মাধ্যমে, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মাধ্যমেই পেতে হবে। এ নয় যে, কোন মানুষকে মাঝখানে রেখে প্রার্থনা কর, আর শেষ পর্যন্ত ঐ বুজ্‌রুগের কাছেই চাইতে শুরু করে দাও।

মূর্খ পীর

যেখানে সেখানে হঠাৎ গজিয়ে উঠা কতকগুলো পীর আমরা দেখতে পাই। এরা আসলে কুরআন হাদীসের ইল্‌ম কিছুই জানে না। বি.এ, এম.এ, ডাক্তারী, মাষ্টারী, উকালতি, ব্যারিষ্টারী সার্টিফিকেট কারো কারো থাকতে পারে কিন্তু কুরআন হাদীসের বিদ্যায় এরা একেবারে ইয়াতিম। কুরআন মাজীদের যে কোন তফসীরের কিতাব অথবা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীসের যে কোন একখানা কিতাব খুলে দিলে, এদের হিম্মত নেই যে, একটা লাইন শুদ্ধভাবে পড়ে দিতে পারে, অথচ এরাই সেজেছে মুসলিম সমাজের পথপ্রদর্শক। এরাই পীরে কামেল, হাদিয়ে জামান।

মহিমান্বিত আল-কুরআনের কোন্ আয়াত, কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, কি উদ্দেশে অবতীর্ণ হল, কুরআনের ধারক বাহক ও প্রচারক, সৃষ্টির সেরা, নবীকুল শিরোমণি, মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ তাঁর জীবনে যত কথা বলে গেছেন, যে সব কাজ করে গেছেন আর যে সব বিষয়ে মৌন সম্মতি দিয়ে গেছেন, সেগুলি জানবার, বুঝবার ও পড়বার সুযোগ যে হতভাগার কপালে জুটল না, সে যদি হঠাৎ চাকরী করতে করতে, ডাক্তারী বা উকালতি করতে করতে, ব্যবসা বা কৃষিকাজ করতে করতে, পীরি-মুরীদির দু'একখানা কিতাবের দু'চারটা গৎ মুখস্থ করে, লম্বা পিরাহান গায়ে দিয়ে ও লম্বা পাগড়ী মাথায় বেঁধে, হঠাৎ পীর সেজে বসে যায় আর লোকজনকে বলে যে আমার হাতে তোমরা মুরীদ হও, আমি আল্লাহ আর তোমাদের মাঝখানে মধ্যস্থ হয়ে তোমাদের সব ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিব, আর এই কথা শুনে হাজার হাজার লোক যদি সেই মূর্খের কাছে ভীড় জমায়, তাহলে সে সমাজ কোন্ স্তরে পৌঁছে গেছে– চিন্তা করা দরকার।

আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সব মূর্খরা নিজেরাই নিজেদেরকে সাইনবোর্ড, পোস্টার, বিজ্ঞাপন ও খবরের কাগজের মাধ্যমে, পীরে কামেল, হাদীয়ে জামান, আওলীয়া কুল শিরোভূষণ, মুজাদ্দেদে মিল্লাত, মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে প্রচার করতে বা কিছু দালালের দ্বারা প্রচার করাতে একটুকুও লজ্জাবোধ করে না বা দিল কাঁপে না। হায়রে স্বার্থ– তোমার মহিমা বুঝা ভার।

আমি সমাজের ছোট বড় সকলের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এই ধরনের মূর্খদের কাছে যাবেন না। এরা কথাবার্তা যতই কায়দা করে বলুক, জেনে রাখবেন, বিরাট এক আর্থিক স্বার্থের জাল পেতে এরা বসে আছে। তবে হ্যাঁ, যাবেন কার কাছে, ইবাদত বন্দেগীর নিয়ম পদ্ধতি শিখবেন কোথায়, ইনশাআল্লাহ সে কথা পরে জানাচ্ছি।

পীর বংশ

হিন্দু সমাজে দেখা যায় ব্রাহ্মণের পুত্র হয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের পুত্র হয় পুরোহিত। ব্রাহ্মণই পৌরহিত্য করার একমাত্র অধিকারী। কেননা হিন্দু ধর্মমতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য ব্রাহ্মণকে বলা হয় বর্ণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার ছেলে হয় পুরোহিত। ছেলে মারা গেলে তার ছেলে, ছেলের ছেলে তস্য ছেলে– এভাবে বংশানুক্রমে এ পৌরহিত্য চলতেই থাকে। পাণ্ডিত্য থাক আর না থাক, কিছু যায় আসে না। কারণ পৌরহিত্য করাটা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের বংশগত ব্যাপার।

বলাবাহুল্য, হিন্দু সমাজের মত আমাদের সমাজেও এক শ্রেণীর বংশ গজিয়ে উঠেছে আর সেটা হচ্ছে এই পীর বংশ। পীর বংশের সবাই পীর, পীর বাবা, পীর মা, পীর দাদা, পীর দাদী, পীর নানা, পীর নানী, পীর খালা, পীর খালু, পীর ভাই, পীর বোন ইত্যাদি সবাই পীর। পীরে পীরে সব একাকার। পীর সাহেব ইন্তিকাল করলেন, ব্যাস্ তাঁর ছেলে হয়ে গেলেন গদ্দীনশীন পীর। ছেলে ইন্তিকাল করলে তাঁর ছেলে, ছেলের ছেলে তস্য ছেলে– এভাবে ব্রাহ্মণদের মত বংশানুক্রমে পীরগিরি চলতেই থাকে। পীর সাহেবের একাধিক ছেলে থাকলে করে নেন সব এলাকা ভাগ। অনেক সময় এলাকা ভাগ নিয়ে গদ্দীনশীনদের মধ্যে লাঠালাঠি, ফাটাফাটি, এমনকি কোর্টকাছারী পর্যন্ত ছুটাছুটি করতেও দেখা যায়। ঠিক এ যেন ফারায়েজ সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা, ঠিক এ যেন বাপের জমিদারী নিয়ে কাড়াকাড়ি। পীর সাহেবের ছেলে না থাকলে ভাই, ভাতিজা, জামাই বা নাতি-পুতা যেই থাক, সেই সেজে বসে গদ্দীনশীন। কারণ এহেন লাভজনক জমিদারীটা বংশের বাইরে যেন চলে না যায়। বিদ্যা না থাক,

ইল্‌ম-কালাম না থাক, কি তাতে আসে যায়। পীরের গন্ধতো আছে। পীরের 'নুৎফায়' পয়দা তো বটে।

বিনা পুঁজির ব্যবসা

পাঠক হয়তো ভাবছেন, মানুষ পীরগিরি করার জন্য এত লালায়িত কেন? মানুষ পীর বলে দাবী করে, বিভিন্ন বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করে, পোষ্টারে, বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজে ও মাইকিং করে নিজকে এত প্রচারণা করে বেড়ায় কেন? কেউ কাছে যেয়ে একটু বসে মুরীদ না হয়ে যদি চলে আসে, তাহলে পীরের মনটা খারাপ হয় কেন? কুরআন হাদীস না পড়েই মানুষ পীর সেজে লোকের দ্বারে দ্বারে ভক্ত বানাবার জন্য ঘুরে বেড়ায় কেন? অধিকতর যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বে পীরের অযোগ্য বা মূর্খ বেটা, ভাই ভাতিজা বা জামাই পীর হয় কেন? কেন পীরগিরিটাকে বংশের বাইরে যেতে দেয়া হয় না। এই পীরগিরিতে আছে কি? পাঠক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এখানে বিরাট এক স্বার্থের খেলা চলছে। সত্যি কথা বলতে কি– পীরগিরির মত লাভজনক ব্যবসা আর কিছুই নেই। আর এতে পুঁজি লাগে না, বিনা পুঁজির ব্যবসা। আপনার ইনকামে আপনার সংসার চলে না, বেড়ার ঘর আপনার পাকা হয় না। চিন্তার কোন কারণ নেই। লম্বা পিরাহান গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে, যিক্‌রে বসে যান আর ওখানে খানকা শরীফ চিশতিয়া, খানকা শরীফ কাদেরিয়া, খানকা শরীফ জালালিয়া, খানকা শরীফ আহ্‌মাদিয়া প্রভৃতি নামের যে কোন একটা নাম চয়েস করে সাইনবোর্ড লিখে ঝুলিয়ে দিন। আর নিজেকে কোন এক পীরের খলিফা বলে দাবী করুন। দেখবেন লোক জুটবে, টাকাও যথেষ্ট পাবেন। বেড়ার ঘর আপনার পাকা হয়ে যাবে। তারপর মাঝে মধ্যে ইসালে সওয়াব কিংবা উরুশ শরীফের মেলা বসাবেন, তখন দেখবেন কোথায় লাগে জমিদারী। হাজার বিশেক লোক যদি জুটাতে পারেন আর কি চাই। খালি হাতে কেউ আসবে না। গড়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে দশটা করে টাকা পেলেও লাখ দুয়েক টাকা হয়ে যাবে। আর যাদের বিশ পঞ্চাশ লাখ ভক্ত আছে তাদের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। তারপর ভক্তরা শুধু যে টাকাই আনবে তাই নয়। কেউ আনবে তেল, কেউ আনবে ঘি, কেউ আনবে চাল, কেউ আনবে ডাল, কেউ আনবে আলু, কেউ আনবে

লাউ-কুমড়া, কেউ আনবে খাসি, কেউ আনবে মোরগ, কেউ আনবে হরিণ, কেউ আনবে গরু। অবশ্য সব উরুসের মেলায় গরু নিয়ে যেতে দেয়া হয় না। কারণ, যে সব পীর ধর্মনিরপেক্ষ পীর বা যেসব খানকায় হিন্দু, মুসলমান, মেথর, মাড়োয়াড়ী সবাই তীর্থ করতে যায়, সেখানে গোমাংস কেন যাবে। গরুর গোশত ধর্মনিরপেক্ষ খাদ্য নয়, ওটা হচ্ছে মুসলমানদের প্রিয় খাদ্য– সাম্প্রদায়িক খানা। যাক ভক্তরা যা নিয়ে আসবে, তাই তারা খেয়ে শেষ করতে পারবে না, মোটা অংকের কিছু বেঁচে যাবে। তাহলে বুঝুন, পীরগিরি ব্যবসাটা কতবড় লাভজনক ব্যবসা। এ ব্যবসার নেশা যাকে পেয়ে বসেছে– সেকি সহজে তা ছাড়তে চায়, তাছাড়া কেউ রাজনীতি করেন, ইলেক্‌শনে নেমেছেন, ভোট চাই হোমরা চোমরা একটা কিছু হতেই হবে। দেখলেন ওমুক পীরের ভক্ত এখানে অনেক। লাখখানেক টাকা নিয়ে যেয়ে পীর সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন হুজুর, জারা মেহেরবানী কিজিয়েগা। হুজুর ভক্তদেরকে বলবেন, তোমরা ভোটটা ইনাকেই দিও, কারণ ইনি আমার খাস ভক্ত। এভাবে কতদিক থেকে কতভাবে যে টাকার আমদানী হয় তা কল্পনাই করা যায় না। আমি এমন এক এলাকার খবর রাখি, যেখানে বর্তমানে কোন পীর নেই। পীর সাহেব কিছুদিন আগে ইন্তিকাল করায় আসন একেবারে খালি। ব্যাস্ আর যায় কোথায়, দু'তিনজন বুজ্‌রুগ ব্যক্তি পীর হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। একজন প্রত্যেক জামাআতে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছেন, আমি বুজ্‌রুগ ব্যক্তি, আমিই পীর হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত, অতএব তোমরা আমার কাছেই মুরীদ হও। আর একজন যেয়ে বলেছেন, শুনলাম নাকি ওমুক তোমাদের কাছে পীর হওয়ার জন্য এসেছিল। খবরদার হুশিয়ার! আমি ওমুকের বেটা ওমুক, ওর থেকে পীর হওয়ার যোগ্যতা আমার মাঝেই বেশী, অতএব আমার কাছেই তোমরা মুরীদ হও।

একদিন ঐ এলাকার এক শিক্ষিত যুবক বলল, আচ্ছা বলুন তো বুজরুগ্‌রা এমন করে বেড়াচ্ছেন কেন? আমি বললাম, উনাদের কি অন্য কোন এলাকায় মুরীদ আছে? বলল, কিছু কিছু আছে। আমি বললাম বুঝতে পারছনা, শুনো তোমাদের এলাকা হল ধানের এলাকা, প্রচুর ধান হয়। আলু পেঁয়াজও মন্দ হয় না। এখন কোনমতে শতখানেক গ্রাম যদি একজন বুজ্‌রুগ হাতে রাখতে পারেন, তো আর যায় কোথা; প্রত্যেক গ্রাম থেকে কমপক্ষে গড়পরতা মণ দশেক করে ধান যদি আদায় করতে পারেন তো একহাজার মণ ধান পাওয়া যাবে। পাঁচ মণ

করে আলু পেয়াজ আদায় করতে পারলে, পাঁচশ' মণ আলু পেয়াজ হবে। তারপর যাকাত, ওশর, ফিতরা ও কুরবানীর চামড়ার অর্ধেক বা সিকি তো আছেই, তাহলে দু'চার শ' বিঘা জমির চেয়ে এই পীরগিরিতেই বেশী ফায়দা। আর এ দুনিয়াটা হল বড় বিচিত্র, আর এখানকার মানুষগুলোও বড় বিচিত্র। কাজেই এ দুনিয়ার একদল সুযোগ সন্ধানী এ সুযোগটা ছাড়বে কেন?

ভক্তদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের আরও ফন্দী আছে। যেমন পীর সাহেব একটা মাদ্রাসা ঘর তৈরী করলেন। ভক্তদের মধ্য হতে দু'একজন উসতাযী রাখলেন। দু'চারটা তালবিলিমকে জা'গীর করে দিলেন। এবার হাজার হাজার ভক্তদের মাঝে যেয়ে বলতে লাগলেন– বাবারা! এবার ওরশ, যাকাত, ফিতরা কুরবানী সবই আমাকে দাও। বাগান দাও, সম্পত্তি দাও। কারণ, আমি বিরাট এক কাজে হাত দিয়েছি। এদেশের কোন ছেলেকে দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, সাহারনপুর আর মিসর যেতে দিব না। ওখানকার পড়া আমার এখানেই হবে। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছি, তোমরা কেবল টাকা দাও– টাকা দাও। ভক্তরা দিতে লাগল টাকা, দিতে লাগল জমি, দিতে লাগল আরো অনেক কিছু। মাদ্রাসার নামে পাওয়া গেল জমি, পাওয়া গেল বাগান, পাওয়া গেল পুকুর, পাওয়া গেল প্রচুর অর্থ কিন্তু মাদ্‌রাসার উন্নতি আর হল না। বিরাট পরিকল্পনা পীর সাহেবের কলবের মধ্যেই থেকে গেল। এখন কৈফিয়ৎ তলব করবে কে? পীর সাহেবই তো সব। তিনিই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই পরিচালক, তিনিই সেক্রেটারী, তিনিই ক্যাশিয়ার– তিনিই সব। তাঁর কাজে ভুল ধরতে গেলে চরম বেআদবী হবে। শিষ্য থেকেই সে খারিজ হয়ে যাবে। কিয়ামতের মাঠে সে পীর সাহেবের শাফাআতই পাবে না। অতএব, যা করেন বাবা পীর কেবলা। পীর সাহেবের ইন্তিকালের পর দেখা গেল, তাঁর ছেলেরা পীরত্ব ঠিকই বজায় রেখেছেন, মাদ্রাসার নামে টাকাও আদায় করছেন; মাদ্রাসাটি কাজীর গরু কিতাবের মত ঠিকই বহাল রেখেছেন, আর মাদ্রাসার যাবতীয় সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে ভোগ দখল করছেন।

মোটকথা পীর বংশটা বংশানুক্রমে বিনা পরিশ্রমে আরামসে যাতে দিন গুজরান করতে পারে, পীরগিরিটা হচ্ছে তারই একটা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তবে সুখের বিষয় এই, বর্তমানে অধিকাংশ লোক পীরগিরির এসব ছলচাতুরী ধরে ফেলেছেন।

ভণ্ড পীরদের কীর্তি কাণ্ড

এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর বা ফকীর আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাদের দাবী হল, কুরআন ত্রিশ পারা নয়– চল্লিশ পারা। তারা বলে দশ পারা আমাদের কাছে আছে। হকিকত ও মারফতীর আসল তত্ত্ব ঐ দশ পারার মধ্যেই আছে। মৌলবীরা ত্রিশ পারা কুরআন নিয়ে কচুরীপানার মত কেবল ভেসেই বেড়াচ্ছে, আর আসল ভেদ আমরাই পেয়েছি। এদের মতে, আবু বকর, উমার, উসমান, আয়িশা (রহ.), ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রমুখ শত শত সাহাবায়ে কেরাম, মহামতি ইমাম ও উলামায়ে দীনের কেউই আসল তত্ত্ব পাননি। একমাত্র তত্ত্ব পেয়েছে এই ফকীরের দল। এদের আরও বক্তব্য হল, ঐ দশ পারা লেখাজোখা নেই। ওগুলো খুব গোপন ব্যাপার, এদের সিনায় সিনায় ওগুলো সব চলে আসছে।

এই পীরদের কল্পিত দশ পারার গুপ্তভেদ এত ঘৃণিত, ন্যাক্কারজনক ও সাম স্যহীন যে, তা বর্ণনা করতে আমি নিজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'চারটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। এদের প্রথম কথা হল, ত্রিশ পারা কুরআনে যে 'বিসমিল্লাহ' লেখা আছে, তা হল 'বীজ্‌মে আল্লাহ' অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে আল্লাহ। সেজন্য এরা বীর্য বা ধাতুকে নষ্ট করা মহাপাপ বলে মনে করে এবং নিজেদের বীর্য নিজেরা খেয়ে ফেলে। নদীয়ায় বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক মুনশী ফসিহুদ্দীন তাঁর কিতাবে এদের 'প্রেমভাজা' খাওয়ার কথা লিখেছেন। আটার মধ্যে বীর্যপাত করে সেই আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে পীর-মুরীদ সকলেই খুশী মনে খায়, তাকেই বলে 'প্রেমভাজা'। এই সব পীরের আখড়ায় কোন আগন্তুক গেলে তাকে একটা কিছু খেতেই হবে। খেতে না চাইলে পীর বাবাজী শত অনুরোধ করে হালুয়া হোক, রুটি হোক বা অন্য কিছু হোক, একটু তাকে খাওয়াবেই খাওয়াবে এবং উক্ত খাবারে পীর বাবাজীর একটু বীজ থাকবেই থাকবে। কেননা গোপন দশ পারায় আছে 'বীজমে আল্লাহ'।

নদীয়ার আরেক প্রখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক তাঁর কিতাবে 'লাল সাধন' বলে আর একটা জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটাও নাকি পীরদের গোপন

দশপারায় লেখা আছে। মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব হলে– সে রক্ত ফেলে দেয়া চলবে না, নাক চোখ বন্ধ করে খেতে হবে– একে বলে লাল সাধন। তাছাড়া অমাবস্যার রাত্রিতে যদি কোন মেয়ের প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব হয়, তাহলে ঐ রক্তমাখা ন্যাক্ড়া একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে, পানিতে ভিজিয়ে রেখে, উক্ত পানি বা পানির শরবত আগন্তুকদের খাইয়ে থাকে। শুনা যায়, এতে নাকি আগন্তুকের চিত্ত-বিভ্রম ঘটে যায় এবং ঐ ব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই নাকি পীরের অন্ধভক্ত হয়ে যায়।

উক্ত পীর সাহেবদের গোপন দশ পারার আর একটা ভেদের কথা হচ্ছে, মেয়েদের যৌনাঙ্গ একটা বয়ে যাওয়া নদীর ন্যায়। একটা মরা পচা দুর্গন্ধময় কুকুর নিয়ে যেয়ে, কেউ যদি ঐ নদীর পানিতে ফেলে দেয়, তাতে ঐ নদীর পানি যেমন নাপাক হতে পারে না, ঠিক সেরূপ কোন মুরীদ তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত করলে, উক্ত যৌনাঙ্গ পীর বাবাজীর জন্য হারাম হতে পারে না। পীর-মুরীদ সবাই মিলে উক্ত যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে পারবে– কারণ ওটা নদীর ন্যায়।

পীরদের কল্পিত দশ পারার আরও গোপন কথা হচ্ছে, শরীরের কোন জায়গায় নখ চুল কাটা যাবে না। চুল দাড়ির জন্য চিরুনী ব্যবহার করতে হবে না। তাতে মাথার চুলে জটা হয় হোক, দাড়িতে জটা হয় হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই বরং জটার অধিকারী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এরা আরও বলে– রসূল যখন মিরাজে গিয়েছিলেন, তখন কি তিনি ক্ষুর, কাঁচি, চিরুনী, নাপিত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? গা– কি তিনি ধুয়েছিলেন ? তাহলে গোসল টোসলের কি দরকার? নখ চুল কাটার বা চিরুনী দিয়ে চুল দাড়ি আঁচড়াবার কি দরকার?

এসব পীরেরা তাদের ভক্তদেরকে বলে, বাবারা মৌলবীর দল আসল ভেদ পাবে কোথায়; আসল তত্ত্ব আমাদের কাছে। ঐ যে, 'আলিফ' অক্ষর দেখছ না? ঐ 'আলিফ' মানে আল্লাহ। আলিফের মাথা যেমন ফাটা, ঠিক তেমনি পুরুষের লিঙ্গের মাথাটাও ফাটা। অতএব বাবারা শুনো, ভেদ আছে– ভেদ আছে। ঐ লিঙ্গের মধ্যেই মারফতীর আসল তত্ত্ব নিহিত আছে।

এদের যুক্তি হল 'বীজ্‌মে আল্লাহ'। আর ঐ বীজ থেকেই যখন মানুষ, তখন মানুষকে মানুষের সাথে মিশে 'ফানাফিল্লাহ' হয়ে যেতে হবে। তাই শত শত

ভক্তের দল পীরের কাছে যায় ফানা হতে। শত শত মেয়েরা যায় দেহ মন উজাড় করে দিতে। পীর সাহেবও তার মাথা ফাটানো আলিফের আশ্চর্য্য কেরামতি দেখিয়ে সকলকে ফানাফিল্লায় পাঠিয়ে দেয়। আর মনের আনন্দে বলতে থাকে–

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে শান্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা
যিনি গুরু তিনিই খোদা
মন পাগলরে গুরু ভজনা।

গুরু বা পীর ছাড়া এরা আর কিছুই বোঝে না। চলতে ফিরতে, খেতে শুতে, উঠতে বসতে, সব সময় পীরের ধ্যান করা, পীরের ছবি মানসপটে অঙ্কিত করে রাখাই হচ্ছে এদের একমাত্র ধর্ম। তেল মাখতে যেয়ে হাতে একটু তেল নিয়ে চোখ দু'টো বন্ধ করে, ধ্যানযোগে পীরকে আগে মাখিয়ে দিয়ে তারপর নিজে তেল মাখে। ভাত খেতে বসে এক মুঠো ভাত ও একটু তরকারী হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে, ধ্যানযোগে আগে পীরকে খাইয়ে দিয়ে, সেই ভাত তরকারী থালার সব ভাতের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তারপর খেতে আরম্ভ করে। এরা সরাসরি মসজিদে বা জামাআতে শরীক না হয়ে হুজরার মধ্যে ধ্যানযোগে পীরকে সিজদা করে। আর পীর যদি সামনেই থাকে তাহলে সরাসরি পীরকে সিজদা করে এবং উবুড় হয়ে পীরের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুষতে থাকে; কেউবা পায়ের তলা চাটতে থাকে। এসব হল গোপন দশ পারার আসল ব্যাপার।

পাঠক হয়ত এসব কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখবেন এদের সংখ্যা বাংলাদেশে নেহায়েত কম না। অবিভক্ত বাংলার শ্রী চৈতণ্যের লীলাক্ষেত্র নদীয়া থেকে বৈষ্ণবদের অনুকরণে এই দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। শ্রী চৈতন্য একজন দার্শনিক ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের দর্শনকে খণ্ডন করার জন্য ইমাম গাজ্জালীর মত, জামালুদ্দীন আফগানীর মত, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর মত ব্যক্তিদের দরকার ছিল। কিন্তু তা না হয়ে নদীয়ার শান্তিপুরের নিকট বুড়ল গ্রামের মুনশী আব্দুল্লাহ গেল চৈতন্যের সাথে বাহাস করতে। শেষে মুনশী আব্দুল্লাহ পরাজিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে চৈতন্যের শিষ্য হয়ে গেল। চৈতন্য

তার নাম রেখে দিরেন 'যবন হরিদাস'। আশুতোষ দেব তার বাংলা অভিধানে যবন হরিদাসের পরিচয়ে লিখেছেন– 'ইনি জনৈক হরিভক্ত মুসলমান'। স্বধর্ম ত্যাগ করে হরিনাম জপে রত হলে এই নামে খ্যাত হন।

বলাবাহুল্য, এই যবন হরিদাসই হল দশ পারা গোপন কুরআন ও ষাট হাজার গোপন কথার আবিষ্কারক। বাউলিয়া, শাহজিয়া, কীর্তনিয়া, বুদ্ধ-শায়েরিয়া, মাইজ-ভাণ্ডারিয়া প্রভৃতি যত পীর ফকিরের দল আছে, এদের গুরু ঠাকুর হল যবন হরিদাস। এরা যবন হরিদাসের চেলা। রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর এরা উম্মত কখনই নয়। বর্তমানে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার এলাকায় এদের সংখ্যা অনেক এবং এদের একটি দল সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। যশোর, খুলনা, রাজশাহী, মোমেনশাহী, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, পাবনা প্রভৃতি জেলায় এদেরকে দেখা যায়। অন্যান্য জেলায় চেষ্টা চলছে। পশ্চিম বাংলা থেকেও মাঝে মধ্যে দু'চারটা অচেনা মুখ এসে টোপ গিলাবার চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের পীররা বাউলিয়া, কীর্তনিয়া, ন্যাড়া, শাহজিয়া, বুদ্ধ-শায়েরিয়া, ভাণ্ডারিয়া, নাগর্দিয়া, সোহাগীয়া, সন্দ্রোশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় অভিহিত হয়ে থাকে। অনেকে আবার বড় বড় আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গানে দীনের নাম ভাঙ্গিয়ে তাঁদের আশেক সেজে, ঝাড় বুঝে কোপ মেরে অতি কৌশলে এই সব ইসলাম বিরোধী কীর্তিকাণ্ড চালু করে থাকে।

আমি প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলছি, আপনারা এই ধরনের পীর-ফকিরদের কাছে যাবেন না। কেননা এরা ভণ্ড; এরা কাফির। আমি নই, মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর ফতহুল গায়েব কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন, শুনুন। তিনি লিখেছেন–

'কুল্লু হাকিকাতিল্ লা ইয়াশ্হাদু লাহাশ্ শারও ফাহুয়া যিন্দীকাহ্।' 'শরীয়ত যে মা'রেফাত বা হাকিকাতের সাক্ষ্য দেয় না– সে মা'রেফাত কুফর।' আমরা দেখছি, উক্ত ভণ্ড পীরদের কোন কথা বা কোন আচরণকে শরীয়ত সমর্থন করে না। শরীয়তের কোন জায়গায় লেখা নেই যে, দশ পারা কুরআন গুপ্তভাবে আছে। ভণ্ড পীরদের দশ পারা কুরআন ও তাদের বক্তব্যগুলো উদ্ভট কল্পনা প্রসূত। অবশ্য প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু যে স্রষ্টার অংশ বিশেষ, মানুষ যে নররূপী নারায়ণ– একথা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলে গেছেন। অতএব যারা 'বীজ্‌মে আল্লাহ' বলে থাকে,

যারা গুরু নামে আছে সুধা, যিনি গুরু তিনিই খোদা– বলে থাকে, তারা যে আসলে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য– এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে মুসলমান বলে অভিহিত করা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহর নবীর যখন মিরাজ হল। তিনি ঘুরে এসে সাহাবাদের কাছে তা ব্যক্ত করলেন, তখন ক্ষুর কাঁচি নরুণের অভাবে তাঁর নখ চুল বড় হয়ে গিয়েছিল; চিরনী ব্যবহার না করায় তাঁর চুলে বা দাড়িতে জটা বেঁধে গিয়েছিল, একথা তো তাঁর সাহাবারা কেউ কোনদিন বলেননি; আল্লাহর নবী যত কথা বলেছেন, যত কাজ করেছেন, যে সব ব্যাপারে মৌন-সম্মতি দিয়েছেন, কোনটাই তো তাঁর সাহাবারা গোপন রাখেননি; আর এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, চুল বড় বড় হয়ে গেল, লম্বা লম্বা জটা ঝুলতে লাগল, নখগুলো সব বাদুরের নখের মত হয়ে গেল, অথচ নিকটে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ দেখতে পেলেন না আর এই ফকিরগুলো সব দেখে ফেলল কিভাবে– বুঝলাম না। আল্লাহর রসূল ﷺ গেলেন, তাঁর মিরাজ হলো, তিনি ফিরে এলেন, এসে দেখছেন বিছানা তখনো গরম, ওজুর পানি তখনো বয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় ঐ সফরে ক্ষুর কাঁচির কি দরকার ছিল তাও বুঝলাম না। আমরা জানি আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় খাবার টাবার কিছু নিয়ে যাননি। খাবার যখন তিনি নিয়ে যাননি তখন এই সব ফকিরদের খাওয়া দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেয়া দরকার। কিন্তু খাবার বেলায় ফকির সাহেবরা তালে ঠিক আছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় যদি লম্বা চুল থাকত, চুল দাড়িতে যদি জটা ঝুলত, নখগুলো যদি বাদুরের নখের মত হতো, তাহলে তাঁর সাহাবাগণ নিশ্চয়ই এ সুন্নাত পালন করতেন, কিন্তু তা তাঁরা করেননি কেন? মহামতি ইমামদের মাথায় বা দাড়িতে এতবড় সুন্নাত ঝুলেনি কেন? খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, আব্দুল কাদের জিলানী প্রমুখ আল্লাহওয়ালাদের মাথায় এ ধরনের জটা কোনদিন শোভা বর্ধন করেনি কেন? অবশ্য হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের মাথায় লম্বা চুল ও জটা আমরা দেখে থাকি। তাদের মহাদেবের মাথাতে জটা আছে। অনেক যোগী সন্ন্যাসীকে বছরের পর বছর গোসল করতে দেখা যায় না। ছোট বেলায় জটাধারী এক ন্যাংটা সন্ন্যাসীকে গঙ্গার ঘাটে নিজের প্রস্রাব নিজেকেই ধরে খেতে দেখেছিলাম। এই ভক্ত পীররা যদি হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের অনুকরণ করে করুক, প্রেম ভাজা

খায় খাক, গাঁজার কলকেয় বা হুক্কা সিগারেটে টান মারে মারুক, যা মন চায় তাই করুক– তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সব সময় বিশ্বাস রাখতে হবে, ইসলামের সঙ্গে ওদের কোনই সম্পর্ক নেই।

যদি কোন মুসলমানের বাচ্চা ওদের পা চুমতে যায়, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অতিসত্বর তার তওবা-ইস্তিগফার করা ওয়াজিব।

মা-বোনদের যৌনাঙ্গকে নদীর সাথে তুলনা করে যা ব্যভিচারের কৃমি-কীটে পরিণত হয়, তারা পীর নয়, ইসলাম বলে তারা শিয়াল কুকুরেরও অধম। এই অধমগুলো শুধু যে লালসাধন ও প্রেমভাজা খাইয়ে মানুষকে বশ্ করে তাই নয়, ঘাড় গুঁজে চক্ষু বুঁজে কিছু কারামতিও জাহির করে থাকে। কারামতের কথা এক্ষুনি শুনবেন। এখানে শুধু এতটুকু বলে রাখছি যে, এসব ভণ্ড পীরের ফাঁদে কেউ যেন পা বাড়াবেন না।

ভণ্ড পীরের কারামতি

ভণ্ড পীররা অনেক সময় অনেক কথা বলে বা অনেক দেখিয়ে মানুষকে অবাক করে দেয়। যেমন, আপনার গাইটা হারিয়ে গেছে– খুঁজে পাচ্ছেন না। পীরের কাছে যেতেই বলে দিল, তুই যে জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছিস বুঝতে পারছি, যা– তোর বাড়ী দক্ষিণ দিকে যে জঙ্গল আছে, সেখানে পাবি। আপনি এসে দেখলে ঠিকই জঙ্গলের মাঝে গাই রয়েছে।

আপনি গরুর গোশ্ত দিয়ে ভাত খেয়েছেন, আপনার বাড়ী উত্তরে একটা নিম গাছ আছে, আপনার বাবা তিন বছর আগে কলেরায় মারা গেছেন। পীর কিন্তু এসব দেখেনি। আপনি যেই পীরের কাছে গেলেন অমনি এসব কথা সে বলে দিল। লন্ডনের আদালতে এক বাঙ্গালীর 'কেস' চলছে। সদ্য তার রায় হয়ে গেছে সুদূর বাংলার মাটিতে বসে আমরা তার কোনই খবর রাখি না পীর বাবাজী ভক্তদের কাছ থেকে উঠে যেয়ে হুজরার মাঝে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে বললো, বাবারা একটু দেরী হয়ে গেল কেন জানো? আমি লন্ডন গিয়েছিলাম একটা কেসের তদবীর করতে, তাই এত দেরী হয়ে গেল। আসামীকে আমি খালাস করে দিয়ে এলাম। দু'চারদিন পর সত্যি সত্যিই পেপারে

দেখা গেল, লন্ডনের আদালতে এক মোকদ্দমায় এক বাঙ্গালী ডিগ্রী পেয়েছে।

আপনার বাড়ীতে দুষ্ট জ্বীনের উপদ্রব আছে। কিন্তু চেষ্টা তদবীর করলেন, তেমন ফল হলো না। মনে মনে ভাবলেন একবার ঐ পীরের কাছে গেলে হতো। পীরের কাছে যেই গেলেন, অমনি বলে দিল, যার জন্য এসেছিস বুঝতে পারছি– যা আর তোকে কষ্ট দিবে না। সত্যি সত্যিই দেখা গেল, তারপর থেকে আর উৎপাত নেই।

তব্বি মিঞা জাতীয় পরিষদের ইলেকশানে প্রচুর ভোটে জিতেছেন। পীর সাহেব তব্বি মিঞাকে বলল, ঐ তোরে বেটা তোর কপালে লেখা রয়েছে তুই মন্ত্রী হবি। বাস্তবিকই দেখা গেল কয়েকদিন পর খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে বের হয়েছে, তব্বি মিঞা মন্ত্রী হয়ে গেছেন।

একদল লোক বসে আছে পীরের কাছে। হঠা পীর সাহেব হুকুম করল চোখ বন্ধ করতো বাবারা, তখন সবাই চোখ বন্ধ করল। এবার পীর সাহেব বলল, এই পুকুরের দিকে তাকাওতো বাবারা, সবাই তাকিয়ে দেখে অবাক– একি। এক কাতরা পানি নেই কেন? পীর বললো আবার চোখ বন্ধ করো, সবাই তখন বন্ধ করল চোখ। পীর বলল, এবার তাকাও পুকুরের দিকে সবাই তাকিয়ে হতভম্ব– একি! এ যে পুকুর ভর্তি পানি। অবাক কাণ্ড।

পীর এবার মাথা হিলিয়ে বললো– হুঁ হুঁ বাবারা ভেদ আছে, ভেদ আছে। এসব মারফতি তত্ত্ব মৌলবীরা পাবে কোথায়?

মোটকথা এ ধরনের বহু কীর্তিকাণ্ড এইসব পীর ফকিররা দেখিয়ে থাকে। আর এসব দেখেশুনে এক শ্রেণীর কমজোর ঈমানের লোক অন্ধভক্ত হয়ে পীরের পায়ে উবুড় হয়ে পড়ে যায়।

কিন্তু জেনে রাখবেন, অনেক হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীরাও ঐরূপ কীর্তিকাণ্ড বা ওর চেয়ে অনেক উচ্চ ধরনের কার্যকলাপ দেখাতে পারে। অনেক মঠে, মন্দিরে, বিহারে, তপোবনে, নদীর তীরে, গঙ্গার ঘাটে, গয়া কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও তারকেশ্বরে গেলে এমন সব ছাই মাথা নেংটা সন্ন্যাসী দেখা যায়, যারা 'বোম ভোলানাথ' বলে গাঁজায় কলকেয় টান মেরে এমন সব অলৌকিক কারামতি দেখায়, যা দেখে মনে হয়, এসব পীর ফকিরগুলো ওদের কাছে বালক মাত্র।

এখন পীর ফকির ও যোগী সন্ন্যাসীদের পক্ষে এসব অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখানো কেমন করে সম্ভব হয়, সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা শুনুন। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কাবা ঘরে তিনশ' ষাটটা প্রতিমা ছিল। একদিন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাযি.)-কে বললেন ঃ হে উমার! তুমি ঐ প্রতিমাগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে এসো। উমার (রাযি.) ভেঙ্গে দিয়ে এসে বললেন ঃ রসূল ভাঙ্গা হয়েছে। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিছু কি তুমি দেখতে পেয়েছো? উমার বললেন, না। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে ভাঙ্গা হয়নি, যাও ভাল করে ভেঙ্গে এসো। এবার উমার যেয়ে দেখলেন, সত্যি সত্যিই সবচেয়ে বড় প্রতিমাটাকে ভাল করে ভাঙ্গা হয়নি। তখন তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ওটাকে ভাঙ্গতে শুরু করলেন। প্রতিমাটি টুকরো হতেই উমার দেখলেন একটি কদাকার কুশ্রী চেহারার নারীমূর্তি এলোকেশে বিকট এক চীৎকার করে ঘর থেকে বিদ্যুৎবেগে বের হয়ে গেল। এবার উমার এসে বললেন, ইয়া রসূল ভাঙ্গা হয়েছে। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু কি দেখতে পেলে? উমার বললেন, একটা কুশ্রী চেহারার মেয়েকে বিকট এক চিৎকার করে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এবার ভাঙ্গা হয়েছে। উমার বললেন, ইয়া রসূল এরূপ দেখলাম কেন? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যেখানে শির্কের আড্ডা, সেখানে দুষ্ট জ্বীন থাকে। ওখানে শির্ক হতো, তাই ঐ মূর্তির মধ্যে জ্বীন আসর হয়ে বসেছিল।

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, শরীয়ত বিরোধী কাজ যেখানে হয়, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র যেখানে করা হয়, মানবরূপী শয়তান যেখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পাতে, সেখানে খবীস জ্বীনের তৎপরতা চলে। ঐ খবীস জ্বীন সমস্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে নিয়ে এসে ঐ পীর ফকীর বা যোগী সন্ন্যাসীরূপী শয়তানের মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দেয়।

আইন পরিষদের গোপন মিটিং-এ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পরামর্শ করলেন যে, তবিব মিঞাকে মন্ত্রী করতেই হবে। ব্যাস আর যায় কোথা; দুষ্ট জ্বীন এ রিপোর্ট নিয়ে এসে ফকিরের মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দিল। লন্ডনের আদালতে একজন বাঙ্গালী মামলায় ডিগ্রী পেল, আর অমনি খবীস জ্বীন তার রিপোর্ট নিয়ে এসে পীরের মুখ দিয়ে 'রিলে' করে দিল।

আপনার গাই জঙ্গলে আছে, আপনি গুরুর গোশ্‌ত দিয়ে ভাত খেয়েছেন, আপনার বাড়ীর উত্তর পাশে নিমগাছ আছে, আপনার বাবা তিন বছর আগে কলেরায় মারা গেছেন, এসব রিপোর্ট কে দিল– ঐ খবীস জ্বীন। আপনার বাড়িতে জ্বীনের উৎপাত। আপনি পীরের কাছে গেলেন। আপনার বলার আগেই পীর বললো, চিন্তা করিস না বেটা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর থেকে দেখা গেল আর উৎপাত নেই, একেবারে বন্ধ। এখানে আপনার ঈমান লুট করার জন্য খবীস জ্বীন কত বড় যে কুটনৈতিক চাল চাললো, একথা আপনার মগজে আর ঢুকল না।

কোন কোন অন্ধভক্ত বলে থাকে, আমার পীর একই সময়ে একাধিক স্থানে দেখা দিয়ে থাকে। আমি বলি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ শয়তানকে এ শক্তি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। কিতাবে পাওয়া যায়–

جسکی چاھے شکل بنا سکتا ھے شیطان لعین
ھو نھی سکتا کبھی وہ سورت خیر الورا

"জিস্‌কী চাহে শেকেল বান সাক্‌তা
হ্যায় শায়তান লায়ীন
হো নেহী সাক্‌তা কভি উহ্‌
সুরতে খায়রুল ওরা।"

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরত কেবল শয়তান ধরতে পারে না। বাকী যে কোন সৃষ্টির আকৃতি সে ধারণ করতে পারে। এখন পীর বা যোগী সন্ন্যাসীর একাধিক সুরত ধরে শয়তান যদি একাধিক স্থানে একই সময়ে দেখা দেয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? শুনুন কিতাবের কথা–

اٹ ھتے اگر ھوے ھوا پر فقیر جی
گوستے ھو آگ میں نہ جلتا ھو انھی
دریا کو پایرتے تو پا تر نہ ھو کبھی
سنت کے ھے خلاف تو سمجھو انھے غبی

উড়তে আগার হুয়ে হাওয়া পর ফকীর জী
ঘুসতে হো আগমে তো না জালতা হো উনভী।
দরিয়া কো পায়েরতে তো পা তর না হো কভী
সুন্নাত কে হ্যায় খেলাপ তো সম্‌ঝো উনহে গাবী।

কোন ফকীর যদি হাওয়ায় উড়তে পারে, কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথচ তার একটা পশমও না পোড়ে, দরিয়ার উপর দিয়ে যদি হেটে চলে যায় আর পা যদি তার না ভিজে। এহেন আশ্চর্য কাণ্ড ফকীরজী যদি দেখাতে পারে, আর সে যদি রসূল মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের খেলাফ কাজ করে, তাহলে জেনে রাখুন, সে আল্লাহর নবীর উম্মত নয়– সে ইবলিশ শয়তানের আসল চেলা।

সুবিখ্যাত বাজীকর পি. সি. সরকারকে আমরা অনেক আশ্চর্য ধরনের কাণ্ড ঘটাতে দেখেছি। তাঁর ছেলেও বর্তমানে পিতার মতই লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে অবাক কাণ্ড দেখিয়ে থাকেন। এখন পি. সি. সরকারের ছেলে যদি পীরগিরির দু' একখানা কিতাব পড়ে, দু' চারটা গৎ মুখস্থ করে, গেরুয়া বসন পরিধান করে, চুলে লম্বা জটা রেখে, কাঞ্চন ঘাটে এসে বসে যান আর অতি কৌশলে তাঁর ইন্দ্রজালের আশ্চর্য ভেল্কী দেখাতে শুরু করে দেন, তাহলে আমরা কি আমাদের জ্ঞান, গরিমা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঈমান-ধর্ম সব কিছু তার পায়ের তলে লুটিয়ে দিব? কখনই না। আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মতে কুরআন হাদীসের কষ্টি পাথরে তাকে পরীক্ষা করে দেখব। আর সব পরীক্ষার আগে তার কাপড় খুলে দেখব, খাৎনা হয়েছে কি না।

পাঠক হয়তো মনে মনে ভাবছেন, তাহলে আল্লাহর যাঁরা ওলী, তাঁদের কি কিছু কারামতি নেই? তাঁরা কি আল্লাহর তরফ থেকে ইলহাম পান না? হ্যাঁ, এবার সে কথাই বলব– শুনুন।

আল্লাহর ওলীদের কারামতি

নিশ্চয়ই আল্লাহর যাঁরা ওলী, তাঁদের মধ্যে কারামত বা বুজুর্গী আছে। নিশ্চয়ই তাঁরা ইলহাম পান। পাবেন না কেন। আল্লাহর তরফ থেকে মনের মধ্যে যে ভাল কথার উদয় হয়, সৎ চিন্তা জেগে উঠে, তাকেই বলে ইলহাম। সামনে একটা কাজ, কাজটা করা ভাল হবে না মন্দ হবে বুঝা যাচ্ছে না। সত্যিকারভাবে কাজটার মধ্যে যদি ভালায়ী থাকে, আর আপনি যদি আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহর প্রিয় হতে পারেন, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে ঐ কাজটা করার প্রেরণা আপনার অন্তরে জেগে উঠবেই উঠবে। আর যদি কাজটার মধ্যে অকল্যাণ থাকে, তাহলে ঐ কাজটার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জাগবেই জাগবে। আল্লাহর ওলী হওয়ার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে, তার অন্তরে আল্লাহর তরফ থেকে ইলহাম বা নেক খেয়াল ও ভাল কথার উদয় হবেই হবে। জাগ্রত বা নিদ্রিত যে কোন অবস্থায় এ ইঙ্গিত তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। আর সেই ভাবটুকু ব্যক্ত করার নামই হচ্ছে কারামত বা বুজুর্গী।

কিন্তু ঐ যে বক-তপস্বী লাখ লাখ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে অর্থের পাহাড় জমাবার ফাঁদ পেতে বসে আছে। ঐ যে লালসা সর্বস্ব বক ধার্মিক একদল দালালের মারফত নিজেকে হাদীয়ে-জামান, পীরে কামেল, আওলিয়াকুল শিরোভূষণ বলে জনগণের মাঝে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ঐ যে কুরআন হাদীস না জানা বে-ইলম মূর্খ পীর, দালালদেরকে 'টুপাইস' বাগাবার সুযোগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে নিজেকে লাখ লাখ মানুষের পথ প্রদর্শক বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে– সে কম বখতরা কখনই ইলহাম বা বুজুর্গী পেতে পারে না। তারা পায় শয়তানী অসওয়াসা বা ইবলিসী বুদ্ধি।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী কারা– তা জানার দরকার। আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ *

"দেখ, যারা আল্লাহর অলী তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই আর তারা কখনো চিন্তিত হবে না। তারা সেই সকল লোক যারা মুমিন হয়েছে আর সর্বদাই মুত্তাকী হয়ে চলে।" (সূরা ইউনুস ৬২-৬৩)

তাহলে এখানে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, মুমিন ও মুত্তাকী যিনি, তিনিই আল্লাহর ওলী, আর যে মুমিন ও মুত্তাকী নয়, সে আল্লাহর ওলী নয়। এখন মুমিন ও মুত্তাকী কে? একথা লিখতে গেলে স্বতন্ত্র এক কিতাব লিখতে হয়। তবে সংক্ষেপ কথা এই যে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর সত্বা ও গুণাবলীর প্রতি, তাঁর একত্ব ও আনুগত্যের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আস্‌মানী কিতাবসমূহের প্রতি, আল্লাহর রসূলগণের প্রতি, মধ্য লোকের প্রতি, কিয়ামতের প্রতি, বেহেশত ও দোজখের প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তকে ঠিকমত যে ব্যক্তি মেনে চলতে পারে, সেই হয় মুমিন, মুত্তাকী– সেই হয় আল্লাহর ওলী।

শরীয়তের বিধানে রয়েছে, তুমি যাবতীয় শির্ক ও কুফর থেকে, ভ্রান্ত আকিদা থেকে, কুসংস্কার থেকে, হিংসা-বিদ্বেষ ও কপটতা থেকে, আত্মশ্লাঘা থেকে, পরশ্রী-কাতরতা থেকে, কৃপণতা থেকে, কাপুরুষতা থেকে, মিথ্যা-প্রবঞ্চণা থেকে মনকে মুক্ত রেখে ঠিকমত আমল কর, অন্যায় থেকে তাওবা কর, আল্লাহর গজবের ভয় ও তাঁর রহমতের আশা পোষণ কর, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরগুজারী কর, বিশ্বস্ত হও, বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহর দেয়া নিয়ামতে সন্তুষ্ট থাক, আল্লাহর উপর নির্ভরতা রাখ, দয়ালু ও বিনয়ী হও, সেই সঙ্গে বড়দেরকে সম্মান কর, ছোটদেরকে স্নেহ কর, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মন্ত্র উচ্চারণ কর, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ পাঠ কর, অপরকে কুরআন শিক্ষা দাও, দু'আ ও আল্লাহর নাম স্মরণ কর, নাপাকী বর্জন কর, বিবস্ত্রতা দূর কর, ফরজ ও নফল রোযা রাখ, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি থাকলে হাজ্জব্রত পালন কর, পরের উপকার কর, ছেলে-মেয়েদেরকে লালন পালন কর, মা বাপের সেবা কর, আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, ন্যায়ের জন্য আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, ধার করজ দিও, অপরের পাওনা মিটিয়ে দিও, প্রতিবেশীর সম্মান রক্ষা কর, লেনদেন ও অন্যান্য ব্যবহারে সাধুতা বজায় রাখ, হালাল উপায়ে উপার্জন কর, কাউকে দুঃখ দিওনা– এসব শরীয়তের আদেশ নিষেধগুলি ঠিকমত যদি তুমি মেনে চলতে পার, তাহলে মুমিন ও মুত্তাকী তুমি হতে পারবে, আধ্যাত্মিক উন্নতি তোমার হবেই হবে। অন্তর ও বাহিরের মনুষ্যত্ব ও মহত্বের বিকাশ তোমার ঘটবেই ঘটবে। হকিকত ও মারেফতের দরজায় তুমি নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবে। পীরের আড্ডায় যেয়ে, পীরের পায়ে আর চুমা দিতে হবে না। উরুসের মেলায় চাল-ডাল কুমড়ো-খাসাঁ নিয়ে যেয়ে খিচড়ী পাকিয়ে

খেয়েদেয়ে হেউ হেউ করে ঢেকুর তুললেই তোমার মারেফত হাসিল হবে না। জেনে রেখ–

کہتا ہے جسے لوگ حقیقت و طریقت
رکہتا ہے جسکا نام مشائخ نے معرفت
وای ڈالیاں ہے بیخ ہے ان سبکی شرعیت
ہو جر نہ پائے در تو جائے شجر الٹ

কহ্‌তা হ্যায় জিসে লোক হকিকত ও তরিকত
রাক্‌খা হ্যায় জিস্‌কা নাম মাশায়েখ নে মারেফাত
ওয়ায় ডালিয়াঁ হ্যায় বেখ্‌ হ্যায় উন্‌সব্‌কী শরীয়ত
হো জর না পায়েদর তো জায়ে শাজার উলাট।

লোকে যাতে তরিকত, হকিকত, মারেফত বলে, ওসব হচ্ছে ডালপালা। মূল হচ্ছে শরীয়ত। মূল যদি মজবুত না হয়, তাহলে ডালপালার অস্তিত্বই থাকবে না।

মোটকথা শরীয়ত ছাড়া হকিকত, তরিকত, মারেফতের অস্তিত্বই নেই। যারা শরীয়তের বাইরে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়, তারা বিভ্রান্ত–তারা কাফির। আর যারা শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলে, তারাই মুমিন মুত্তাকী–তারাই আল্লাহর ওলী। আল্লাহ তাঁদের অন্তরে ইলহাম অর্থাৎ নেক খেয়াল দিয়ে কারামত অর্থাৎ বুজ্‌রুগী দান করেন।

ভক্তি যেখানে অন্ধ

পীরপরস্তি এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা মানুষকে একেবারে অন্ধ করে দেয়। কয়েক বছর আগের কথা বলছি, তখন আমি কলকাতায় মাসিক তওহীদের সম্পাদনার কাজে লিপ্ত ছিলাম। একদিন এক ব্যবসায়িক হাজী সাহেব মাগরিবের নামাযের পর আমাকে বললেন, আজ এক কাণ্ড ঘটে গেছে, দাদ ভাল করতে যেয়ে কুষ্ঠব্যাধি হয়ে গেছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার; বললেন, এক ফকীর 'দে

বাবা খাজা দে দেলাদে– দে বাবা খাজা দে দেলাদে' বলে চিৎকার করতে করতে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো, আমি জোরসে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলাম। খানিকটা যেই গেছে, আবার তাকে ডাক দিলাম– একটু বুঝিয়ে বলব বলে। ফকির ঘুরে এল। তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললাম, ঐ মালাবা হোটেলে গোশত রুটি কিনে খাস। আর খবরদার, খাজা বাবার কাছে কিছু চাস্ না, খাজা বাবার কিছুই দিবার ক্ষমতা নেই। আল্লাহর কাছে চাইবি– আল্লাহই দেনেওয়ালা। ফকির টাকাটা হাতে পেয়ে বলছে, 'বাহ্‌রে খাজা বাহ্, দুশ্‌মন সে ভী তু দেলাতা হ্যায়? দে বাবা খাজা দে-দেলাদে।' বলতে বলতে ফকীর চলে গেল। আমি বললাম, হাজী সাহেব! ভক্তি যেখানে অন্ধ, প্রমাণ সেখানে অচল। অন্ধ ভক্তের কাছে কুরআনে দলীল, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীসের দলীল অচল।

এ প্রসঙ্গে আর এক ঘটনা শুনুন। অনেকদিন আগের ঘটনা। এক পীর সাহেব তাঁর এক শিষ্যকে বললেন– বাবা সহীরুদ্দীন! আমার গাইটা তাল পুকুরের পারে চরছে, সন্ধ্যার সময় নিয়ে এসে গোয়ালে বেঁধে দিসতো বাবা। সহীরুদ্দীন বলল হুজুর, আপনি গাই একটা কিনেছেন শুনেছি কিন্তু চোখে এখনো দেখিনি। পীর সাহেব বললন, গাই বেশ মোটাসোটা, রং সাদা আর শিং দু'টো ছোট ছোট। একথা শুনে ঠিক সন্ধ্যার সময় সহীরুদ্দীন তাল পুকুরের পার থেকে গাই এনে পীর সাহেবের গোয়ালে বেঁধে দিল। আর ভালভাবে খল-ভুষী খেতে দিয়ে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে দিল। সকাল বেলায় পীর সাহেবের স্ত্রী গোয়াল ঘরে যেয়ে দেখে, খুব বড় তাক্‌ড়া এক ষাঁড় বাঁধা রয়েছে। পীর সাহেবের স্ত্রী তো কেঁদেই আকুল। পীর সাহেবও বিচলিত হয়ে সহীরুদ্দীনের কাছে যেয়ে বললেন, বাবা সহীর আমার গাই কই? দুধ না হলে আমার চলে না। তোর পীর মায়েরও চলে না– তাই চার সের দুধের গাই কিনে এনেছি, সেই গাই আমার কোথায় দিলি বাবা? সহীর বলল হুজুর, আপনার আদেশ শিরোধার্য করে সন্ধ্যার সময় গাই এনে গোয়ালে বেঁধে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, ভালভাবে খল-ভুষা খেতে দিয়েছি। পীর সাহেব বললেন, গরুতো একটা বাঁধা রয়েছে রে বাবা, কিন্তু ওটা তো আমার গাই নয়, একটা ষাঁড় বাঁধা রয়েছে। আমার গাই কোথায় গেল? সহীর বলল হুজুর! আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, গাইটা কেমন? আপনি বললেন, বেশ মোটাসোটা, রং সাদা আর শিং দু'টো ছোট ছোটও বটে– অমনি

আপনার গাই হাঁকিয়ে নিয়ে এসে আপনার গোয়ালে বেঁধে দিলাম। পীর সাহেব বললেন, একটু পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলি না কেন? সহীর বলল, দেখতে তো বলেননি হুজুর, বললে নিশ্চয়ই দেখতাম। আপনি সব সময় আমাদেরকে বলেন, আমি যা বলব তাই শুনবি, এর বাইরে একচুল যাবি না। তাহলে কেমন করে আপনার কথার বাইরে যেতে পারি হুজুর বলুন।

বলাবাহুল্য, একেই বলে অন্ধভক্তি। এই অন্ধভক্তি পীর পূজকদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তারা পীর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা মনে করে পীর মুক্ত, পীর সর্বস্তরে বিরাজিত, পীর সবকিছুই জানেন। পীরের মূর্তি মনের মাঝে এঁকে নিয়ে ধ্যান করলে, সেই মূর্তির মাঝে পীরের রূহ এসে তার মনে ফয়েজ বা প্রেরণা যোগায়। এই বিশ্বাসে পীর পূজকরা পীরের মূর্তি মানসপটে এঁকে নিয়ে পীরের ধ্যানে মশগুল থাকে।

শুধু পীর পূজকদের দু'চারটা ওযীফা এখানে পাঠকদেরকে উপহার দিচ্ছি। লালনের ভক্তরা বলে–

লালনের মত কামেল পীর ত্রিভুবনে নাই
অতএব লালনের সবে তরীক ধর ভাই।

এনায়েতপুরের ভক্তরা চোখ বন্ধ করে মাথা হিলিয়ে হিলিয়ে ওযীফা পাঠ করে–

যত নবী ওলী সব হবে মালগাড়ী
আর ইঞ্জিন হয়ে নিয়ে যাবে এনায়েতপুরী

ভাসানী সাহেবের অন্ধভক্তদের ওযীফা শুনুন।

দয়াল ভাসানী
তোমার ঘাটে এলাম আমি, পার করে নাও।
দয়াল ভাসানী
তোমার হালে হাল ধরেছি, পার করে নাও।
দয়াল ভাসানী

কি যে দয়াল তুমি, বুঝেও বুঝি না আমি।
তোমার দয়ায়, তোমার দু'আয়
ভাসিছে মোর জীবন তরী
এক ওসীলায় আমায় তুমি পার করে নাও।
দয়াল রে–
তুমি যে কি যাদু জানো, হৃদয় ধরে টানো
ওগো দয়াল, ওগো নিঠুর ভাসানী
তুমিই আমার খাজা, তুমিই আমার রাজা
আমায় খাস প্রজা করে নাও। (হক কথা ২১/৩/৮৩)

আর একদল ঢোলে তালি মেরে মেরে ঘাড় হিলিয়ে হিলিয়ে কি ওযীফা পাঠ করে শুনুন–

امداد کن امداد کن از بندے گم ازاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد قادر

এম্‌দাদ কুন এম্‌দাদ কুন আয্‌ বান্দেগম আযাদ কুন
দর্‌দীন ও দুনিয়া শাদ কুন ইয়া শেখ আব্দুল কাদেরা।

অর্থাৎ আমাকে মদদ কর, আমাকে মদদ কর, দুঃখ দুশ্চিন্তা হতে আমাকে মুক্ত কর, দীন ও দুনিয়ায় আমাকে সুখী কর, হে শেখ আব্দুল কাদের।

আর একদলের ওযীফা শুনুন–

پرا کر تو ارجو میری
آے بابا خاجه اجمیري
آے بابا خاجه اجمیري

পুরা কর তু আরজু মেরী
আয় বাবা খাজা আজমিরী
আয় বাবা খাজা আজমিরী।

তারা আরও বলে থাকে–

مدد کن یا معین الدین چشتي

مدد کن یا معین الدین چشتي

মদদ কুন ইয়া মঈনুদ্দীন চিশতি

মদদ কুন ইয়া মঈনুদ্দীন চিশতি।

তারা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নিরানব্বইটা নাম তৈরী করে নিয়ে নিয়মিতভাবে সেই নামের ওযীফা পাঠ করে থাকে। সে নামগুলি হচ্ছে এই–

আউয়ালো ইয়া মঈনুদ্দীন, আখেরো ইয়া মঈনুদ্দীন, জাহেরো ইয়া মঈনুদ্দীন, বাতেনো ইয়া মঈনুদ্দীন, জাব্বারো ইয়া মঈনুদ্দীন, গাফফারো ইয়া মঈনুদ্দীন, সাত্তারো ইয়া মঈনুদ্দীন, কুদ্দুসো ঈয়া মঈনুদ্দীন, রাহ্‌মানু ইয়া মঈনুদ্দীন ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যে নিরানব্বইটা গুণবাচক নাম রয়েছে, ঐ নামগুলি সব খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির নামে লাগিয়ে দিয়ে মঈনুদ্দীন চিশতিকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের বহু কথা রয়েছে। বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ক্ষান্ত হলাম। শির্ক আর কাকে বলে; এরূপ আকিদার নামই শির্ক। যারা মানুষ হয়ে মানুষকে আল্লাহর আসনে বসায়; যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার উপর অপরের কথাকে গুরুত্ব দেয়, মুশরিক তারাই। কবি বলেন ঃ

خداسے اور بزرگوا سے بہی کہنا

یہی ھے شرك یارو اسسے بچنا

خدا فرما چکا قرآن کے اندر

میرے محتاج ھے پیر وپیغمبر

نہی تاقت سوا میرے کسی میں

جو کام آے تمھاری بکاسی میں

جو محتاج ہو وے دسرے کا
بہلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

খোদাসে আওর বুজুরগুঁ সে ভী কহ্না
এহী হ্যায় শেরক্ ইয়ারো ইস্সে বাচ্না
খোদা ফরমা চুকা কুরআন কে আনদর
মেরে মুহতাজ হ্যায় পীর ও পয়গম্বর
নেহী তাকত সেওয়া মেরে কিসীমে
জো কাম আয়ে তুম্হারী বেকাসী মে
জো মুহতাজ হো বে দুস্রে কা
ভালা উস্সে মদদ কা মাগ্না কিয়া?

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই অন্ধত্ব থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা করি।

পীরদের আউট বুদ্ধি

বিদ্যান হোক আর মূর্খ হোক, আলিম হোক আর জাহিল হোক, সব শ্রেণীর পীর কিন্তু আউট বুদ্ধি খাটিয়ে থাকেন খুব বেশী। আউট বুদ্ধি, ট্যাক্টিস, চালাকী ও চতুরতা না খাটালে কোন পীরই তার পরীরগিরি কায়েম রাখতে পারেন না। এক জাঁদরেল পীর তাঁর কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে এক মাহফিলে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে এক ষাঁড় চরছিল। কাছাকাছি যেয়েই ষাঁড়টাকে লক্ষ্য করে খুব গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ' ভক্তরা সব অবাক কি ব্যাপার! মাহফিলে যেয়ে অনেকের কানে তারা কথাটা দিল। সবাই ব্যাপারটা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। মাহফিল শেষ হল। হুজুর বৈঠক ঘরে ঢুকে পড়লেন। লোকজন কিন্তু কেউ উঠল না।

ভেদ জানার জন্য সবাই থেকে গেল। প্রধান সাহাবীরা ভিতরে ঢুকে খুব আদবের সাথে বলল, হুজুর সব লোক বসে আছে একটা কথার জানার জন্য, যদি একটু মেহেরবানী করতেন তো ভাল হতো। হুজুর একটু মৃদু হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, বুঝেছি– ঐ সালামের ব্যাপারটা তো? ভক্তরা শুনেতো অবাক। কেউ কেউ বলল, হুজুর বুঝলেন কেমন করে যে আমরা সালামের কথাটাই জানতে চাই; কেউ কেউ বলল, হুঁ–হুঁ একি যার তার ব্যাপার; কামেল পীররা সবই জানতে পারেন, কারণ উনারা হলেন টেলিভিশন। আমাদের মনের খবর সবই উনাদের কাছে ধরা পড়ে।

এবার পীর সাহেব বললেন শুনো, আমি যখন আসছিলাম, আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দু'জন ফেরেশতা ঐ ষাঁড়ের শিং-এ দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই ওরা আমাকে সালাম দিল, তাই আমি ওদের সালামের জওয়াবে বললাম, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ'। একথা শুনে ভক্তরা সব খুশীর চোটে কেঁদে ফেলল, আর বলতে লাগল, সৌভাগ্য আমাদের যে, এহেন কামেল পীর আমরা পেয়েছি।

এক পীর উরুসের মেলা বসিয়েছেন। ভক্তরা সব খাসী, মোরগ, চাল, ডাল, তেল, আটা প্রভৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে। এক ভক্ত খুব-সুরত এক দুম্বা নিয়ে হাজির হয়েছে। ভক্তের দিলের আকাঙ্ক্ষা, হুজুর যদি উঠে এসে দুম্বাটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতেন তো ভাল হতো। এই বলে দুম্বাটাকে বাইরে বেঁধে রেখে সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পীর কেবলা তখন প্রধান ভক্তদের নিয়ে আসর জমিয়েছেন ভাল। এমন সময় দুম্বাওয়ালা তার মনের কথাটা পীরকে বলল। পীর সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে হাতের ইশারা করে বললেন, যাও হাত বুলিয়ে দিলাম। ভক্তের কিন্তু এতে মন উঠল না। বলল, হুজুর একটু কাছে যেয়ে গায়ে হাতটা যদি দিত পীরতো চটে লাল; বললেন বিশ্বাস হয় না তোমার। আমি এখানে বসে চোখ বন্ধ করে লন্ডনের আদালতে মামলার তদবীর করে আসি, আর এখানে বসে তোমার দুম্বার গায়ে হাত বুলাতে পারব না? যাও, হাত বুলিয়ে দিয়েছি– যাও ভক্ত হুজুরের পায়ে চুমা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আর এক ঘটনা শুনুন। এক পীর সাহেবের নাম ছিল 'লাল বুজুক্কার'। একদিনের ঘটনা, এক গ্রামের রাস্তা দিয়ে গভীর রাতে একটা হাতী চলে গেছে।

গ্রামের লোকেরা কিন্তু কেউ কোনদিন এ চিহ্ন দেখেনি। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের পীরও কোনদিন এরূপ চিহ্ন দেখেনি। ভোরবেলায় উঠে একজন লোক হাতীর পায়ের দাগ দেখে ডাক-হাঁক শুরু করে দিল। এক দুই করে গ্রামের ছোট-বড় মেয়ে-মরদ সবাই জুটে পড়ল। দাগ দেখে সবাই হয়রান, ব্যাপারটা কারো মাথায় আর আসে না। কেউ বলে কিয়ামত খুবই নজ্‌দিক, এটা তারই আলামত। কেউ বলে ভূমিকম্প হয়ে গ্রাম ধ্বংস হবে, এটা তারই আলামত। কেউ বলে গ্রামে কলেরা মহামারী আসবে, এটা তারই আলামত। মোটকথা, গ্রামের সকলেই আতঙ্কিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। কয়েকজন লোক ছুটল পালকী নিয়ে পীর সাহেবকে আনতে। পীর সাহেব এসেই বললেন চিন্তা নেই কেঁদ না। আমি থাকতে কোন মসিবত আসতে দিব না। এই বলে তিনি হাতীর পায়ের দাগ দেখে চিন্তা করতে লাগলেন এবং বৈঠক ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ধ্যানে বসে পড়লেন। আউট বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বের হয়ে বিকট এক চিৎকার করে বলতে লাগলেন–

لال بزککر نہ سکے تو اور سکیگا کو
پاو میں چکی باندہکے شاید ھرن کدا ھے

লাল বুজুক্‌কার না সাকে তো
আওর সাকেগা কো
পাও মে চাক্কী বাঁধ্‌কে শায়েদ
হরিণ কুদা হো।

লাল বুজুক্‌কার পীর না পারলে এ রহস্য আর কে বলতে পারবে? শুন, শুন, চার পায়ে চারটা চাক্কী (যাঁতা) বেঁধে একটা হরিণ এ রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেছে।

এ কথা শুনে গ্রামের লোকদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। যথাসম্ভব সম্মান করে পীর সাহেবকে তারা পৌঁছে দিল।

এ ধরনের চালাকীর কথা কত শুনবেন। আর এক ঘটনা শুনুন। এক এলাকার চল্লিশ পঞ্চাশটা গ্রামের লোক ছিল তাঁতী। তাঁতের কাপড় বুনাই ছিল

তাদের একমাত্র পেশা এবং তারা সবাই ছিল এক গদ্দীনশীল ভণ্ড পীরের অন্ধভক্ত। এক সময় এক মিসর ফেরতা বিখ্যাত আলিম তাবলীগের উদ্দেশ্যে ঐ এলাকার গ্রামে গ্রামে যেয়ে ওয়াজ নসিহত শুরু করে দিলেন। ওয়াজ নসিহত শুনে এলাকার লোক খুবই মুগ্ধ হতে লাগল। কেউ কেউ পীর সাহেবের কাছে যেয়ে ওয়াজের প্রশংসা করতে লাগল। প্রশংসা শুনে পীর রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বললেন, তোমাদের মতো আহাম্মক তো দেখি না। যার তার কথায় একেবারে গলে যাও দেখছি। নিয়ে এসোতো বেটাকে ধরে, দেখি সে কত বড় আলিম হয়েছে। আমার একটা কথার জওয়াব যদি সে দিতে পারে তাহলে বুঝব, হ্যাঁ কিছু জানে; আর যদি উত্তর দিতে না পারে, গলা ধাক্কা দিয়ে বেটাকে এলাকা ছাড়া করব। তোমরা যাও, যেয়ে কাল বিকেলে শিমুলতলীর হাটখোলায় তাকে হাজির কর। আর আমার সব মুরীদানকে জানিয়ে দাও– সবাই যেন হাজির থাকে।

এবার ভক্তরা সব ছুটল মাওলানার কাছে। সব কথাই খুলে বললেন মাওলানাকে। মাওলানা একজন বিরাট আলিম। ইল্‌মে কুরআন, ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে ফিকাহ, ইল্‌মে ওসুল, ইল্‌মে বালাগাত, ইল্‌মে মান্‌তেক ও ইল্‌মে আদবে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। কাজেই ঘাবরাবার পাত্র তো তিনি নন। তাছাড়া তিনি বেড়াচ্ছেন তাবলীগে-দীনের উদ্দেশে, কোন দুরভিসন্ধি তো তাঁর নেই; অতএব মাওলানা পরের দিন বিকেলে শিমুলতলীর হাটখোলায় হাজির হলেন। যেয়ে দেখেন হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। চল্লিশ পঞ্চাশটা গ্রামের সব লোক জমা হয়েছে। বাহাসের বিরাট প্রস্তুতি। পীর সাহেবের সাথে মাওলানার হবে বাহাস। মাওলানা তো অবাক! একি ব্যাপার? যাক তিনি তাঁর আসনে যেয়ে বসলেন। একটু পরেই খুব জাঁকজমকের সাথে পীর সাহেব এসে সামনাসামনি তাঁর আসনে বসে পড়লেন। লোকের কোলাহল এবার থেমে গেল। পীর সাহেব মাওলানাকে লক্ষ্য করে গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, কি সাহেব শুনছি নাকি আমার এই এলাকায় এসে আজে বাজে কি সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন। মাওলানা বললেন– আস্তাগফিরুল্লাহ, কে আপনাকে বলল যে আমি আজে বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছি। আল্লাহর ফজলে আমি একজন আলিম। মিসর থেকে পাশ করে এসে কিছু তাবলীগের উদ্দেশে বের হয়েছি। কুরআন হাদীস প্রচার করে বেড়াচ্ছি।

পীর সাহেব পীরগিরির ভঙ্গিমায় মাথা হিলিয়ে হিলিয়ে বলতে লাগলেন, বুঝেছি সাহেব বুঝেছি, বড় আলিম বলে নিজেকে তো প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, বলি কুরান জানেন তো? মাওলানা বললেন, জানব না কেন? আল্লাহর ফজলে কুরআনের বড় বড় তাফসীরের কিতাবগুলি সবই পড়েছি। পীর সাহেব বললেন–

আসালাংলাং ফাসালাংলাং

আবে আয়ে আবে গ্যায়ে

ফাবে থপ্‌থপ্‌ ফাবে থপ্‌থপ্‌।

বলুন তো সাহেব, এই আয়াতের মানে কি? আর এটা কাদের শানে নাযিল হয়েছে?

মাওলানা তো হতভম্ভ। বললেন, একথা ত্রিশপারা কুরআনের কোন জায়গায় যদি আপনি দেখাতে পারেন তো এক্ষুণি আপনাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কর দিব। পীর সাহেব ভীষণ এক গর্জন করে বললেন, ত্রিশ পারা নিয়েই পড়ে থাকেন সাহেব– ত্রিশ পারা নিয়েই পড়ে থাকেন। আরও যে দশ পারা কলবের মধ্যে আছে সে খরবতো রাখেন না; হিয়া বড়া মাওলানা সেজে বসে আছেন। যান, আমার এলাকা ছেড়ে চলে যান। তারপর ভক্তদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যতসব আহাম্মকের দল; যে ব্যক্তি একটা কুরআনের আয়াতের খবর রাখে না, তার ওয়াজ শুনে সব পাগল হয়ে গেছে, দাও এ ভণ্ডকে এলাকা ছাড়া করে দাও। ভক্তরা হুকুম পাওয়া মাত্র মাওলানাকে এলাকা থেকেই তাড়িয়ে দিল।

এবার পীর সাহেবকে সবাই ধরল যে, হুজুর ঐ আয়াতটার মানে আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। হুজুর বললেন, ওগো আমার প্রিয় শিষ্যরা শুন, এ আয়াত একমাত্র তোমাদের শানেই আমার কলবে নাযিল হয়েছে। তোমরা যখন তাঁতের কাপড় তৈরী কর, সেই সময়কার ঘটনাটাই এই আয়াতে সুন্দর করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ডান পায়ে করে যখন চেপে ধর, তখন বলা হচ্ছে 'আসালাংলাং' আর বাম পায়ে করে যখন চেপে ধর, তখন বলা হচ্ছে 'ফাসালাংলাং', ডান দিক থেকে সূতার গুটি যখন বামে যায়, সে অবস্থাটাকে বলা হয়েছে 'আবে আয়ে' আর বামে থেকে যখন ডানে যায়, তখন বলা হচ্ছে 'আবে গ্যায়ে' আর যখন চাপ দিয়ে সূতার গায়ে সূতা বসিয়ে দাও, তখনকার অবস্থাটা হচ্ছে 'ফাবে থপ্‌থপ্‌– ফাবে থপ্‌থপ্‌।

তারপর পীর সাহেব বললেন, বাবারা শুন! তোমাদের কাজটাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেছেন বলেই আল্লাহর খাস্ রহমত স্বরূপ এ আয়াত আমার কলবে নাজিল হয়েছে, অতএব তোমরা বেশক জান্নাতী। এ কথা শুনে মুরীদের দল পীরের পায়ে চুমা দিয়ে পীর কেবলা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে প্রস্থান করল। এই ঘটনা উল্লেখ এজন্য করলাম যে, অনেক পীর নিজের প্রভাব, পীরত্ব ও ভাত রুটি চলে যাওয়ার ভয়ে, কোন যোগ্য ও জবরদস্ত হক্কানী আলেমকে নিজের এলাকায় ঢুকতে দিতে চান না।

এ ধরনের কত কথা শুনবেন। জনৈক জাঁদরেল পীর এক এলাকা থেকে আর এক এলাকা যাবেন। সকাল সাতটার ট্রেন তাঁকে ধরতেই হবে। পীর আগেই তাঁর দু'জন খাস ভক্তকে চুপে চুপে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন আর কানে কানে বলে দিলেন যে, আমার স্টেশন যাওয়ার আগেই যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে দিও। এদিকে পীর সাহেবের নাস্তাটাস্তা হয়ে গেল– পালকী হাজির। পীর সাহেব কিন্তু ইচ্ছা করেই দেরী করছেন। সবাই বলল হুজুর, তাড়াতাড়ি উঠুন, তা না হলে ট্রেন পাবেন না, দু'মাইল রাস্তা যেতে হবে। হুজুর বললেন, এত বড় শক্তি যে ট্রেন আমাকে ফেলে চলে যাবে? জেনে রেখো ট্রেন আমার সাথে কখনই বেয়াদবী করবে না। এই বলে পীর সাহেব কয়েক মিনিট দেরী করেই পালকীতে উঠলেন। পালকী স্টেশন হতে কোয়াটার মাইল দূরে থাকতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। হুজুর ট্রেন ছেড়ে দিল, হুজুর ট্রেন ছেড়ে দিল– বলে ভক্তরা চেঁচাতে শুরু করে দিল। হুজুর বললেন চেঁচাও কেন? জেনে রেখ, ট্রেন আমার সাথে কখনই বেআদবী করবে না। সত্যিই ট্রেনটা আউট সিগ্নালের কাছে যেয়ে থেমে গেল। আর পালকীর কাছ থেকে ট্রেনের দূরত্বটা অনেকটা কমে গেল। হুজুর যেয়ে ট্রেনে উঠলেন, আর সেই সঙ্গে পীর সাহেবের মস্তবড় কারামতি জাহের হয়ে গেল।

আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর কতকগুলো ভক্তকে বুজুরগীটা এভাবে বর্ণনা করতে দেখা গেছে। একদিন হুজুর কেবলা পালকীতে চড়ে ট্রেন ধরার জন্য রওয়ানা হলেন। হাফ মাইল দূরে থাকতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সবাই তখন বলল, হুজুর, ট্রেন তো ছেড়ে দিল। আমাদের হুজুর পাক তখন বললেন, বাবারা চিন্তা করো না, আমাকে না নিয়ে

ট্রেন যাবে না। সত্যিই দেখা গেল, ট্রেন প্লাটফরমের বাইরে যেয়ে থেমে গেল। ট্রেন আর কোন মতে চলে না। ড্রাইভারের শত চেষ্টা ব্যর্থ হল। এমন সময় হুজুর পাক যেয়ে পালকী থেকে নামলেন। এবার ব্যাপারটা বুঝতে আর কারো বাকী থাকলো না। ড্রাইভার ও গার্ড ছুটে এসে হুজুরের পা দু'টো জড়িয়ে ধরল। হুজুর তখন ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে একটা ফুঁক মেরে দিয়ে বললেন, যাও– এবার চালাও। ড্রাইভার ইঞ্জিনে উঠেই দেখে, কলকব্জা সব ঠিক হয়ে গেছে। ট্রেন এবার চলতে আরম্ভ করল। ভাইসব, আমাদের হুজুর এমন হুজুর ছিলেন যে, রেলগাড়ী তাঁর কথা শুনতো। এ ধরনের বহু কথা আছে। ঘটনা ঘটে এক– আর নিজেদের কারামতি জাহের করার জন্য রূপ দেয় আর এক।

আর একটা ঘটনা শুনুন। এক পীরের আড্ডায় পীর ও তার ভক্তদেরকে বিকট চিৎকার করে হেলে-দুলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করে যিক্‌র করতে দেখে এক হাজী সাহেব বলেছিলেন, তোমরা যিক্‌র করো তো এত নাচো কেন? সঙ্গে সঙ্গে পীর বাবাজী উত্তর দিল, বাবা, কেবল হাজী হলেই হয় না, কুরআনের খবর টবর রাখতে হয়। এই বলে পড়তে শুরু করে দিল ঃ

কূল আউযো বেরব্বিন নাছে, মালেকিন নাছে, ইলাহিন নাছে, মিন শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছে, আল্লাযী ইয়ো-ওয়াছ বিছু ফী সুদুরীন নাছে, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাছে। অর্থাৎ– রব নাচে, মালেক নাচে, ইলাহি নাচে, জিন-ইনসান সবাই নাচে, নাচে না কেবল খান্নাস।

আর এক আউট বুদ্ধির কথা বলবো। এক পীর ভক্তের গ্রামের একটি ছেলে আমার কাছে পড়তো। ছেলেটি বাড়ী গেলেই পীর সাহেব তাকে প্রশ্ন করতো, আচ্ছা বলতো বাবা, আউযোবিল্লার বাপ কে? 'আলিফ' কেন খাড়া হযে আছে আর 'বে' কেন পড়ে আছে? জিমের পেটে কেন নুক্‌তা? ছেলেটি বলতো, এগুলো সব বাজে প্রশ্ন। শরীয়তের আদেশ নিষেধের কথা কিছু জিজ্ঞেস করুন। পীর তখন বলতো, বাবা– ভেদ আছে, ভেদ আছে। মৌলবীদের কাছে এসব পাবে না। এসব হচ্ছে মারফতী তত্ত্ব।

এক পীরের কাছে কোন লোক গেলেই তাকে এক গ্লাস পানি আনা করাতো। তারপর ঐ পানিতে লাঠির মাথাটা একটু ডুবিয়ে দিলে বলতো– লে

বেটা খেয়ে লে। ভক্ত পানি খেয়ে দেখে একেবারে মিছরীর সরবত। কিন্তু পীর যে আগেই কাম সেরে রেখেছে তা আর কয়জন বোঝে। মানে– লাঠির মাথায় 'সেকারিন' দিয়ে রেখেছে।

এক মুনসেফ সাহেবের একটা ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে মুনসেফ সাহেব জনৈক পীরের কাছে গেলেন। দূরে থেকে মুনসেফ সাহেবকে দেখে পীরের জনৈক ভক্ত পীরের কানে কানে বলে দিল যে, হুজুর আজ তিন দিন হল মুনসেফ সাহেবের ছেলে হারিয়েছে, তাই আপনার কাছে আসছেন। সামনে যেতেই কোন কথা না শুনেই চোখ বন্ধ করে ঘাড় হিলিয়ে হিলিয়ে পীর বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা! মাত্র তিনদিন হল, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, ফল পাবে– ফল পাবে। মুনসেফ তো শুনেই অবাক, একি! কেমন করে ইনি জানলেন যে, আমি ছেলের জন্য এসেছি এবং আমার ছেলে তিনদিন হলো হারিয়েছে। যাক, তিনি আবেদন নিবেদন জানিয়ে চলে এলেন। আল্লাহর মর্জি, ছেলেটি কয়েকদিন পর ফিরে এলো। পীরের ভক্ত এ রিপোর্টটাও পীরের কানে দিয়ে দিল। ছেলে ফিরে আসায় মুনসেফ সাহেব খুসী হয়ে কিছু উপঢৌকন নিয়ে পীরের কাছে যেতেই, সেই আগের ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, মুনসেফের বেটা বলি নাই যে ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য ধরো, ফল পাবে, ফল পাবে। কি হলো– ছেলে এসেছে তো? বাবা, ভেদ আছে ভেদ আছে।

মোটকথা আউট বুদ্ধি খাটিয়ে পীররা তাদের ব্যবসাকে ঠিক রেখেছেন। আর জনমত তাদের অন্ধভক্ত হয়ে পা চাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। অন্ধভক্তরা তদন্ত করে দেখল না যে, আউট সিগ্‌নালের কাছে ট্রেনটা কেন থামল? যে পীর বাংলার মাটিতে বসে চোখ বন্ধ করে লন্ডনের আদালতে মামলার তদবীরে যায়, যে পীর একই সঙ্গে একাধিক সুরত ধরতে পারে, যে পীর নিজেকে টেলিভিশন বলে দাবী করে সকলের মনের খবর বলে দেওয়ার স্পর্ধা দেখায়, যে পীর ঘরে বসে চোখ বুজে বাইরে বাঁধা দুম্বার গায়ে হাত বুলাতে পারে; সেই পীরের ভক্ত যখন তারই সামনে মটর গাড়ির তলায় পড়ে মারা যায়, কেন সে পীর তখন হাত ইশারায় গাড়ীটা রুকে দিয়ে দুর্ঘটানর হাত থেকে, তার ভক্তকে বাঁচাতে পারে না? এ সব সাধারণ কথা যদি ভক্তদের মাথায় না ঢুকে, তাহলে তাদের অন্ধত্ব ঘুচাবে কে?

পীরদের সিজদার দাবী

অনেক পীর বলে থাকেন যে, তাজিমের সিজদা হালাল। সেজন্য তাঁরা মুরীদদের কাছ থেকে সিজদা নিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন ফেরেশতারা যখন আদমকে সিজদা করেছিলেন, তখন মুরীদরা কেন পীরকে সিজদা করবে না? তারা আরও বলেন, ইবলিশ যেমন আদমকে সিজদা না করে শয়তান হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি কোন মুরীদ যদি তার পীরকে সিজদা না করে, সেও শয়তান হয়ে যাবে। এই ফতোয়ার পর কোন অন্ধভক্ত আর স্থির থাকতে পারে কি? তাই দেখা যায়, দলে দলে সব ভক্তরা এসে পীরের পায়ে সিজদা করে থাকে। পীর সাহেবও 'এডিশনাল গড' সেজে দাঁতের গোঁড়ায় গোঁড়ায় হাসতে হাসতে সিজদা গ্রহণ করেন। পীর মরে গেলেও ছাড়াছাড়ি নেই। ভক্তরা কবরে যেয়ে মাথা ঠুকতে থাকে।

কিন্তু এই ভ্রান্ত দল এতটুকু বুঝতে সমর্থ হল না যে, ফেরেশতরা আর মানুষ কখনো এক জীব নয়। ফেরেশতারা যা করে মানুষের জন্য তা করণীয় নয়; আর মানুষ যা করে, ফেরেশতাদের জন্য তা করণীয় নয়। তাছাড়া আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের হুকুম করেছিলেন যে, আদমকে সিজদা কর, তাই তারা সিজদা করেছিল। কিন্তু এই পীর নামধারী জীবগুলোকে কে হুকুম করল যে, মানুষ হয়ে মানুষকে সিজদা করতে হবে? পীররা কি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত নয়? যদি উম্মত না হয় তাহলে তারা কাফের। আর যদি উম্মত হয়, তাহলে শেষ নবী যে শরীয়ত রেখে গেছেন তাই তাদেরকে মানতে হবে। তাঁর আগের কোন বিধি বিধান মানা যেতে পারে না। রসূল মুহাম্মদের আগে ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে দেখি, আপন ভাই-বোনে বিয়ে হালাল ছিল, মদ খাওয়া প্রভৃতি বৈধ ছিল। তাই বলে কি এই পীর সাহেবরা আপন বোনকে বিয়ে করবেন? শত সহস্র স্ত্রী গ্রহণ করবেন? মদ খাওয়া চালু করবেন? আর এক কথা হচ্ছে, আল্লাহ যে ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'উস্‌জুদু লি আদামা'-এর অর্থ এ নয় যে, আদমকে সিজদা কর। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আদমের কারণে আল্লাহকে সিজদা কর। একথা তাফসীরের কিতাব ও আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, সিজদা শুধু আল্লাহকেই করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকে সিজদা করা হারাম।

দারেমী কিতাবে জাবের থেকে বর্ণিত আছে, আর তাবারানীতে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রসূল বলেছেন ঃ

لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر

অর্থাৎ কোন মানুষের পক্ষে অন্য কোন মানুষকে সিজদা করা হালাল নয়।

আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনু মাজা প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে লেখা আছে, একদিন মুআয বিন জাবাল (রহ.) ইয়ামান থেকে ফিরে এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন একি? মুআয বললেন, আমি ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে দেখেছি, তারা তাদের বড় বড় পাদ্রীদেরকে সিজদা করে থাকে। আমিও তাদেরকে বলেছিলাম একি ব্যাপার? তারা বলেছিল, এ হচ্ছে নবীদের সালামের পদ্ধতি। একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন ঃ ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের নবীদের নামে মিথ্যা অভিযোগ আবিষ্কার করেছে। তুমি কখনো এমন করো না। আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ মুআযকে বললেন, আচ্ছা মুআয বল দেখি, তুমি আমার কবর জিয়ারত করতে গেলে কি কবরে সিজদা করবে? মুআয বললেন, না। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, খবরদার তোমরা এমন কাজ কখনো করো না। (মেশকাত)

তাফসীর ইবনু কাসীরে আছে, সাহাবী সালমান ফার্সী তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একদিন মদিনার কোন রাস্তায় আল্লাহর রসূলের সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি আল্লাহর রসুল ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল তাঁকে বললেন, দেখ সালমান, আমাকে সিজদা করো না। যিনি চিরঞ্জীবি ও মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি কেবল মাত্র তাঁকেই সিজদা করবে।

আল্লাহ ছাড়া অপরকে সিজদা করা যে হারাম, যে সব পীর তাদের ভক্তদের কাছ থেকে সিজদা নিয়ে থাকে আর যে সব অন্ধভক্ত পীরকে সিজদা করে থাকে, তারা যে ধর্মভ্রষ্ট ও মিথ্যুক এতে কোনই সন্দেহ নেই।

যিকিরের রহস্য

এক শ্রেণীর পীর বলেন, শরীরের মধ্যে ছয়টা লতিফা আছে। ডান স্তনের একটু নীচে আছে 'লতিফায়ে কলব'। বাম স্তনের একটু নীচে আছে 'লতিফায়ে রুহ্'। নাভির নীচে আছে 'লতিফায়ে নফস্'। দুই স্তনের মাঝখানে আছে 'লতিফায়ে সের'। কপালে আছে 'লতিফায়ে খফী'। আর তালুতে আছে 'লতিফায়ে আখফা'। তাঁরা বলেন, 'লা' শব্দটাকে লতিফায়ে নফস্ হতে অর্থাৎ নাভীর নীচে থেকে টেনে বের করে 'লতিফায়ে সের' অর্থাৎ দুই স্তনের মাঝে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে থেকে 'লতিফায়ে খফী' অর্থাৎ কপালে ও তথা হতে 'লতিফায়ে আখফা' অর্থাৎ তালুতে নিয়ে যেতে হবে। 'ইলাহ'কে ধরে নিয়ে যেয়ে লতিফায়ে 'রুহ্' অর্থাৎ বাম স্তনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে যেয়ে 'ইলাহ'কে ছেড়ে দিয়ে 'ইল্লাল্লাহ'কে ধরে নিয়ে যেয়ে 'লতিফায়ে কল্ব' অর্থাৎ ডান স্তনের কাছে ধাক্কা মারতে হবে। এভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করতে হবে।

যিকির আমাদেরকে করতেই হবে কিন্তু যে সব লতিফার কথা উল্লেখ করে পীর সাহেবরা যিকিরের ফর্মুলা বের করেছেন, তার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে আছে কি-না সেটাই হল আমাদের দেখার বিষয়। পবিত্র কুরআনে একশত চৌদ্দটা সূরা আছে, মোট ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টিটা আয়াত আছে। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, পীর সাহেবদের ছয় লতিফার কথা কোন আয়াতে পাওয়া যায় না। তারপর বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্ প্রভৃতি হাদীসের কিতাবগুলো খুঁজে দেখেছি, প্রিয় নবীর কোন হাদীস থেকে ছয় লতিফার বিবরণ মিলে না। তাহলে প্রশ্ন হল, ছয় লতিফার বিবরণ পীর সাহেবরা পেলেন কোত্থেকে? অবশ্য কোন কোন পীর বলেন, এসব গোপন তথ্য আল্লাহর নবী হযরত আলী (রাযি.)-কে দিয়ে গেছেন। হযরত আলী (রাযি.) আবার এসব তথ্য হাসান বসরীকে দিয়ে গেছেন। হাসান বসরীর কাছ থেকে নাকি পীর কিবলারা সব কলবে কলবে পেয়ে আসছেন। তাই যদি হয়, তাহলে হযরত আলী বাদে বাকী সাহাবীদের বাঁচার পথ কি? আল্লাহর নবীর স্ত্রীদের অবস্থাই বা কি হবে?

পীর কিবলারা এ সম্পর্কে কি বলেন? আল্লাহর নবী ছয় লতিফার মূলতত্ত্ব কাউকে না দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাযি.)-কে দিয়ে গেলেন– একথা বলায় আল্লাহর নবীকে কি পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা হচ্ছে না? যারা এরূপ আক্বিদা পোষণ করে, তারা কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পাঠকগণ তার বিচার করবেন।

আর এক শ্রেণীর পীর আছে, মেয়েদেরকে মুরীদ বানাতে বেশী আগ্রহী। যখন কোন মেয়ে মুরীদ হতে যায়, তখন তাকে নির্জন নিরালা ঘরে বসিয়ে ডান স্তনে, বাম স্তনে, নাভীর নীচে, দুই স্তনের মাঝে, কপালে ও তালুর নীচের লতিফা চিনাতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ জানেন কোথায় যেয়ে এর শেষ হয়। আমার মনে হয়, এ দৃশ্য দেখে মস্তবড় আজাজিলেরও কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়।

যিকিরের এই সমালোচনা শুনে অনেকেই হয়ত ভাবছেন, তাহলে বোধ হয় যিক্‌র করাই বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু না, কখনই তা ভাববেন না। কুরআন ও হাদীসে যখন যিক্‌রের ফজিলতের কথা উল্লেখ রয়েছে, তখন যিক্‌র আমাদেরকে করতেই হবে। আল্লাহ বলেন, 'فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ' আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন দল আল্লাহর যিক্‌রে বসে যান, তখন ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে ও আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাদের উপর আল্লাহর শান্তি নাযির হয় আর আল্লাহর নিকটবর্তী যারা আল্লাহ তাদের কাছে ওদের কথা উল্লেখ করেন। (মেশকাত)

আল্লাহর নবী ﷺ আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না, তাদের উপমা হচ্ছে, জীবিত ও মৃতের মত। (বুখারী)

কাজেই যিক্‌র আমাদেরকে করতেই হবে। তবে যিক্‌র কাকে বলে, সেটাই জানার দরকার। যিক্‌র শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা বা স্মরণে রাখা। আল্লাহর যিক্‌র করা মানে আল্লাহর সঙ্গে মনের যোগ সাধন করা। শব্দের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধই নেই। তবে মনের কোন ভাব বা মস্তিষ্কের কোন চিন্তা ভাষার বাহনকে অবলম্বন না করে প্রকাশ পেতে পারে না। তাই এক শ্রেণীর লোক শব্দের

আশ্রয় না নিয়ে স্মরণীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন। কিন্তু তথাকথিত এই মারফতী পীর বা ফকিরের দল, আল্লাহর বিভিন্ন নাম ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমাকে নিয়ে লতিফার উল্লেখ করে যেভাবে বিকট চীৎকার করে থাকে, আর উৎকট ও উদ্ভট কৃচ্ছ্র সাধনার প্রশ্রয় দিয়ে থাকে– তা কখনই যিক্‌র নয়। ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এসব হচ্ছে এদেশের 'বামমার্গী' প্রভৃতি ভ্রান্ত সাধকদের অন্ধ-অনুকরণ আর অন্যদিকে হচ্ছে 'রিয়া' বা লোক দেখানো বুজুর্গী প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। আল্লাহর সঙ্গে যখন যার মনোযোগ ঘটবে, তখন তার পক্ষে ঐরূপ উৎকট লম্প-ঝম্প বা উদ্ভট হৈ হৈ চীৎকার আদৌ সম্ভবপর নয়।

আর একদল মারফতী পীর বা ফকির বলেন, ছয় লতিফার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিক্‌র হচ্ছে থার্ডক্লাসের লোকের জন্য, আর যারা সেকেন্ড ক্লাসের লোক তারা কেবল 'আল্লাহু আল্লাহু' জপ করবে। আর একেবারে আপার ক্লাসের পরম বিশিষ্ট সাধক যারা, তারা কেবল হু-হু-হু-হু করবে।

কিন্তু আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের যিক্‌রের হুকুম দেখি না। আল্লাহর রসূল ও আল্লাহ! আল্লাহ! বা হু-হু-হু-হু জপ করার ব্যবস্থা দেননি। ইসলামী শরীয়তে যিক্‌রের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা অর্থপূর্ণ আর নির্দিষ্ট কোন না কোন উদ্দেশ্যের সহায়ক।

যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল–

فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمُ

"আপনি আপনার মহিমান্বিত রবের নামে তাস্‌বীহ করুন" তখন আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলমানদেরকে বললেন ঃ "اِجْعَلُوْا فِيْ رُكُوْعِكُمْ" এটাকে তোমরা রুকুতে পালন করবে।

যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল, "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى" আপনার রহমান রবের তাসবীহ করুন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলমানদেরকে বললেন ঃ "اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ" তোমরা এটাকে সিজদায়

পালন করবে। রসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার তাৎপর্য বুখারীতে লেখা আছে, আল্লাহর রসূল রুকুতে "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ" আর সিজদায় "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" পাঠ করতেন। শুধু ইয়া রব, ইয়া রব বা আল্লাহু, আল্লাহু বা কেবল হু-হু-হু-হু করতেন না। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহর নামের তাসবীহ ও যিক্‌র অর্থবোধক সম্পূর্ণ বাক্যের দ্বারা করতে হবে।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّه وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّه

অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ আর সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে– "আল-হামদু লিল্লাহ"। (ইবনু মাজা)

বুখারীতে আছে, আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের পর চারটি বাক্য হচ্ছে উত্তম এবং তা কুরআন থেকেই নেয়া হয়েছে। এ চারটি বাক্য হচ্ছে ঃ (১) সুবহানাল্লাহ (২) আল-হামদুলিল্লাহ (৩) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (৪) আল্লাহু আকবার।

বুখারী ও মুসলিমে আছে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ*

উচ্চারণ ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" বলবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

বুখারীতে আরও আছে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি বাক্য জবানে উচ্চারণ করতে খুব সহজ কিন্তু ওজনের পাল্লায় খুব ভারী আর রহমানের খুব প্রিয়, বাক্য দু'টি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।"

ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো নামাযে আল্লাহু আকবার, রব্বানা লাকাল হামদু, সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রব্বিয়ার আলা, আল-হামদু লিল্লাহ প্রভৃতি পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক কাজের সূচনায় বিস্‌মিল্লাহ বলতে হয়।

মোটকথা, আযানে, ইকামতে, নামাযে, হাজ্জে, ঈদে, প্রত্যেক কাজের আরম্ভে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বদেশে-বিদেশে, সব সময়ে যে সব তাস্‌বীহ ও যিক্‌র করার ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রসূল দিয়েছেন, সেগুলির কোনটাই এক শাব্দিক বা অসম্পূর্ণ বাক্য নয়।

আপার ক্লাসের লোকগুলো যে হু-হু-হু-হু করে থাকে, এরও কোন প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই। 'হু' শব্দটা হচ্ছে সর্বনাম। এর অর্থ হচ্ছে 'সে'। যারা কেবল সে-সে-সে-সে করে থাকে তারা পথভ্রষ্ট। কারণ এক শব্দ দিয়ে বা অসম্পূর্ণ কথা দিয়ে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কখনো যিক্‌র করেনি। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের যিক্‌র করতে বলেননি। 'হু' শব্দ কোন বাক্য নয়। হু শব্দ দ্বারা কোন নিশ্চিত অর্থ বুঝা যায় না। হু-হু শব্দটা ভয়াবহ ফিত্‌নার উৎস। 'হু' শব্দের সাথে ইসলামী যিক্‌রের কোনই সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে আগাগোড়া বিদ'আত ও গোমরাহী। মানুষের অন্তর যে, সব সময় একই অবস্থায় থাকবে, আল্লাহর সত্তার সঠিক ধ্যান ধারণা যে মানুষের অন্তরে সব সময় বিরাজ থাকবে– তা থাকতে পারে না। কেমন করে কোন্ অলক্ষে যে বিভ্রান্তির মায়া হৃদয়ে স্পর্শ করে, কেউ তা টের পায় না। সে জন্য আল্লাহ তাঁর সকল শ্রেণীর বান্দাকে তাওবা করতে বলেছেন। কাজেই হু-হু-হু-হু করলেই যে আল্লাহকে ডাকা হবে– তা নাও হতে পারে। বরং সে সময় তার অন্তরে বিরাজমান বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত হতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে সে গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাবে। অতএব তথাকথিত ঐসব মারফতী ফকিরদের উদ্ভট যিক্‌র থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে হুশিয়ার থাকতে হবে।

অর্থবোধক পূর্ণ বাক্য দিয়ে যিক্‌র করার কথা শরীয়তে রয়েছে, সেরূপ যিক্‌রই আমাদেরকে করতে হবে। যিক্‌র দুই প্রকারে আমরা করতে পারি। কোন

অন্যায় কাজ সামনে এলে আল্লাহকে স্মরণ করে তা থেকে যদি বিরত হতে পারি, কোন অন্যায় যদি হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করে তাওবা ইস্তিগফারের বাক্য যদি মনে মনে পড়তে পারি, তাহলে এটা হবে খুবই মূল্যবান। একে বলে 'যিক্‌রে খফী।' তাছাড়া আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য নিম্নস্বরেও উচ্চারণ করতে পারি। এ ধরনের যিক্‌রকেও যিক্‌রে খফী বলে।

আর এক ধরনের যিক্‌র হচ্ছে– "যিক্‌রে জলী"। তথাকথিত পীর ফকিররা লম্ফ ঝম্ফ করে গুরু গম্ভীর স্বরে বিকট চীৎকার করে যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে থাকে, এটাকেই তারা বলছে– "যিক্‌রে জলী"। কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষের সাথে মানুষ সাধারণ স্বরে যেভাবে কথা বলে, সাধারণত যে স্বরে মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করে সেই স্বরে আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করাকে "যিক্‌রে জলী" বলে।

আযান ছাড়া আল্লাহর যত প্রকার প্রশংসাসূচক বাক্য আছে, সবগুলোর উচ্চারণ সাধারণ স্বরেই করতে হবে। খুব জোরে চলবে না। কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈল ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করছে–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا *

"নামাযে চীৎকার করে তিলাওয়াত করো না, আর একেবারে নিম্নস্বরেও তিলাওয়াত করো না। বরং দুয়ের মাঝামাঝি পথ ধরো।"

নামাযে যা কিছু পড়া হয়, সেগুলো অবশ্যই যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, বিকট চীৎকার করে যিক্‌র করা হারাম।

একদিন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধে যাচ্ছেন, সাহাবীরা সঙ্গে আছেন। একটা উপত্যকা পার হবার সময় কয়েকজন সাহাবী "আল্লাহু আকবার", "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে খুব জোড়ে চীৎকার শুরু করে দিলো। তাতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

'হে জনগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হয়ে খুব জোরে চীৎকার থেকে বিরত হও। জেনে রেখো, তোমরা কোন বধিরকে বা অনুপস্থিতকে ডাকছো না।

আরও জেনে রেখো, তোমরা এমন একজন শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও নিকটবর্তীকে ডাকছো, যিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (বুখারী, মুসলিম)

পাঠক এথেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, অর্থবোধক পূর্ণ বাক্য দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ, আল্লাহর প্রশংসা-ব্যঞ্জক পর্ণবাক্য নিম্নস্বরে বা সাধারণ স্বরে উচ্চারণ করাকেই যিক্‌র বলে। আর এর ব্যতিক্রম ঘটালেই বুঝতে হবে, ওটা যিক্‌র নয়– 'মক্‌কর'।

পীরি-মুরীদির কল্যাণে কবরপূজা

পীরি মুরীদির কল্যাণে সবচেয়ে যে জিনিসের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে, সেটা হচ্ছে কবরপূজা। পীর মরে গেলেও ছাড়াছাড়ি নেই। পীর বেঁচে থকতে যে সম্মান পেতেন, মরে যাওয়ার পর তার শতগুণ সম্মান পেয়ে থাকেন। পীর মরে গেলেন, কবরটাকে তাঁর বাঁধিয়ে দেয়া হল। শুধু তাই নয়, যেসব ওলী আল্লাহ ও বুজুরগানে দীন কবর পূজার গোর বিরোধী ছিলেন, তাঁদের কবরগুলোকেও কবর পূজকরা পাকা করে দিয়েছে। কালক্রমে বাঁধানো কবরগুলোকে মাজার শরীফে পরিণত করা হয়েছে। কোন কোন কবরের উপর গম্বুজ অথবা ঘর তৈরী করা হয়েছে। স্বর্ণ রৌপ্য খচিত দরজা লাগানো হয়েছে। নীচে ছঙ্গে মর্মরের ফরাশ বিছানো হয়েছে। কবরের উপর ভক্তরা হাজার হাজার ফুল ছিটায় বাতি জ্বালায়, আতর গোলাব ও ধুপধুনার সুগন্ধি ছাড়ায়। কেউ কেউ মাজারের চারদিকে তওয়াফ করে। কেউবা করজোড় দাঁড়িয়ে থাকে, কেউবা রুকু করে, কেউবা সিজদার অবস্থায় পড়ে থাকে। কেউ মানত মানে, কেউ হাজত পুরার আবেদন জানায়, কেউ সরাসরি পীরের কাছেই চায়, আবার কেউ কেউ কবরে শায়িত মরা পীরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চায়। যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যে আল্লাহ অমর, যে আল্লাহ ক্ষমাশীলও দয়ালু সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে শায়িত মরা মানুষের উপর ভরসা তাদের অধিক। কেবল যে নিরেট মূর্খরা যায় তাই নয়। অনেক উকিল, অনেক ডাক্তার, অনেক অফিসার ও অনেক ব্যবসিককেও পীরের

মাজারে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ধন্না দিতে দেখা যায়। কেউ বলে আমার রোগ ভাল করে দাও, কেউ বলে আমার চাকরীর প্রমোশন করে দাও, কেউ বলে আমার মামলায় আমাকে জিতিয়ে দাও, কেউ বলে ইলেক্‌শনে আমাকে জয়ী করে দাও, কেউ বলে ব্যবসায় উন্নতি দাও, কেউ বলে আমার নিয়াত পুরা করে দাও। কেউ বলে আমাকে ছেলে দাও। মানিক পীরের দরগায় ছেলে চাওয়ার একটা প্রর্থনা শুনুন ঃ

ওগো বাবা মানিক পীর
এসেছি তোমার দ্বারে
হয়ে নিতান্ত অধীর।
ওগো বাবা মানিক পীর
দয়া করে একটি ছেলে
দাওনা আমার কোলে তুলে
ঠাণ্ডা হোক কোলখানি মোর
মনটা হোক স্থির
ওগো বাব মানিক পীর।
আমি ছেলে কোলে হেথায় আসি
দিব তোমায় জোড়া খাসি
আর পেট ভরিয়ে খাইয়ে দিব
এক শত ফকির
ওগো বাবা মানিক পীর।

দিনাজপুরের চেহেলগাজীর মাজার, রংপুরের পাগলাপীর ও বড়দর্গার মাজার, বগুড়ার মহাস্থানের মাজার ও রাজশাহীর বিড়াল দহের মাজার পাকা রাস্তার ধারেই অবস্থিত। গাড়ী ঘোড়া, বাস, ট্যাক্সি ও লোকজনের চলাচলের পথের ধারে ঐ ধরনের হাজার হাজার মাজার আমাদের দেশে বিরাজ করছে।

বলাবাহুল্য, প্রতিদিন ঐ সব মাজারে শত শত টাকার আমদানী হয়ে থাকে। গাড়ী থামিয়ে মাজারে পয়সা দেয়া হয়। অন্ধ ভক্তদের ধারণা, পয়সা না দিলে কবরে শায়িত ঐ মৃত বুজরুগ ব্যক্তি, পথের মাঝে গাড়া উল্টে দিয়ে, জান মালের ক্ষতি করে দিতে পারে। কাজেই কিছু পয়সা-কড়ি দিয়ে-থুয়ে, বুজরুগের মাথা ঠাণ্ডা রাখাই ভাল।

কিন্তু এর দ্বারা ঐ কবরে শায়িত ব্যক্তির চরিত্রকে যে কলঙ্কিত করা হচ্ছে– এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও ঐ ভদ্রলোকের নেই। আমি বলি হুঁশিয়ার! তোমাদের বিরুদ্ধে ঐ বুজরুগ ব্যক্তি হাসরের দিনে আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ! আমার চরিত্রকে এরা কলঙ্কিত করেছিল, তার আজ বিচার চাই। আল্লাহ বলবেন, তুমি মরে গিয়েছিলে আর এরা বেঁচে ছিল। তোমার চরিত্রকে এরা কেমন করে কলঙ্কিত করল? তখন তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! আমি নাকি পয়সা লোভী ছিলাম। পয়সা না পেলে, আমি নাকি যে কোন বিপদে ফেলে অথবা গাড়ী উল্টে দিয়ে জান মালের ক্ষতি করে দিব– এরূপ জঘন্য ধারণা আমার চরিত্রের উপর এরা পোষণ করত। তার আজ বিচার চাই। আল্লাহ সেদিন মানহানির কেসে অপরাধী সাব্যস্ত করে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। অতএব পয়সা দাতারা হুঁশিয়ার!

অনেক পীরভক্তকে আজমীর শরীফে (?) যেতে দেখা যায়। যে মঈনুদ্দীন চিশতী রহমতুল্লাহ আলাইহি শির্ক ও কবরপরস্তির মূলোৎপাটনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, কালের চক্রবৎ পরিবর্তন ও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে আজ সেই মহান ব্যক্তির কবরে শির্কের আড্ডা গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার মন পোলাও সেখানে পাকানো হয়। দরগাহ শরীফ (?) এর চীফ এজেন্ট প্রতি বছর অসংখ্য বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আজমীরে তীর্থ যাত্রার মহাপুণ্যের কথা প্রচার করে থাকে। যারা যেতে অক্ষম তাদেরকে টাকা-পয়সা পাঠাতে বলা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, যারা টাকা দিতে পারবে, কেবল তাদেরকেই তাবাররুক ও খাজা বাবার নিরানব্বই নামের ওযীফা বিজ্ঞাপন মারফত দেয়া হবে। আর যে কমপক্ষে সোয়া পাঁচ টাকা পাঠাতে পারবে না। হাজার বার ওযীফা পড়লেও তার কোনই ফায়দা হবে না।

অনেক অন্ধ ভক্তের বিশ্বাস, তিনবার আজমীরে তীর্থ করতে গেলে এক হাজ্জ হয়ে যায়। শুধু আজমীর বলে নয়। দেশের বহু মাজার সম্পর্কে পীরভক্তরাও এ ধারণা পোষণ করে থাকে।

বছর পনের আগের কথা বলছি। তখন বর্ধমানে থাকতাম। এক সময় এক সভা উপলক্ষে মালদহের পথে ট্রেনে চেপে কাটিহার রওয়ানা হয়েছি। ট্রেন ওল্ড মালদহে থামতেই দেখি, দু'জন লোক ছেলে মেয়ে নিয়ে ট্রেনে উঠল। তাদের কাছে লোটা, কম্বল ও হাঁড়ি-বাসন দেখে মনে হল, এরা ঠিক তীর্থযাত্রী। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাওয়া হয়েছিল। একজন বলল, আমরা পাঁড়ুয়া (পাণ্ডুয়া) শরীফ গিয়েছিলাম। বলেই আমার হাত চেপে ধরে বলল হুজুর, একটু দু'আ করবেন যেন, আমার হজ্জটা পুরা হয়ে যায়। আমি বললাম, টাকা কি দাখিল করেছেন নাকি? বলল হুজুর, চারবার যাওয়া হল আর তিনবার গেলেই হজ্জটা হয়ে যাবে– একটু দোওয়া করবেন। বললাম কোথায়? বলল ঐ পাঁড়ুয়া শরীফ। বললাম সেখানে কি আছে? বলল জানেন না? সেখানে দরগাহ শরীফ আছে। যে– যে নিয়তে যায়– সে নিয়ত তার পুরা হয়। যে যা চায়– সে তা পায়। যে লোকটি আমার সাথে কথা বলছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা চোখ তার কানা ছিল। আমি বললাম, যে যা চায়– সে তা পায় সেখানে, সেখানে চার চারবার গেলে আর তোমার চোখটা চেয়ে আনতে পারলে না? কানা তখন ভীষণ রেগে যেয়ে বলল, সেখানে লম্বা পিরাহান গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে, এত বড় বড় পীরে কামেল ও হাদীয়ে জামান বসে আছেন যে, তোমার মত মৌলবীকে প্রস্রাবের পানি দিতে নেয় না। আমি বললাম, যে দলিল পেশ করলে বাবা, এর উপর কোন দলিলই খাটবে না। তবে এই দু'আই করব, যেন আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের ঐ আল্‌খাল্লাধারী পীরে কামেলদেরকে হিদায়াত করেন।

মাজারে গেলে হাজ্জ হয়, মানুষের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হল কেমন করে? আমি বলব– ঐ পীরি মুরীদির কল্যাণে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

لا تشدر رحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا

'লা তুশাদ্দুর রিহালো ইল্লা ইলা সালাসাতে মাসাজিদ, আল মাস্‌জিদিল হারামি, ওয়াল মাস্‌জিদিল আকসা, ওয়া মাস্‌জিদি হা-যা।'

তোমরা পাথেয় বেঁধে নিয়ে নেকীর উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর কর না। একটি কাবা মসজিদ, আর একটি হচ্ছে আল আক্‌সা মসজিদ, আর অন্যটি হচ্ছে আমার এই মসজিদ মসজিদে-নববী। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ তিন জায়গা ছাড়া পাথেয় বেঁধে নিয়ে নেকীর উদ্দেশে অন্য কোথাও সফর করা চলবে না। এটা কোন ব্যবসাদারী কথা নয় বা অবান্তর কথা নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর নবীর কথা।

অনেকে হয়তো বলবেন, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া কি নিষেধ? আমি বলব, না। কবর যিয়ারত মোটেই নিষেধ নয়। কেননা আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত 'তুযাহ্‌হিদু ফিদ্‌দুনিয়া ওয়া তুযাক্‌ কিরুল আখিরাহ।' দুনিয়ার প্রতি মানুষকে উদাসীন করে দেয় আর পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইবনু মাজাহ)

কিন্তু ঐ যে মাজার, যার উপর মনোরম ইমারত বানানো হয়েছে, মূল্যবান চাঁদোয়া যার শোভা বর্ধন করছে; দামী চাদর দিয়ে যাকে ঢেকে দেয়া হয়েছে; ছঙ্গে মর্মরের ফরাস যেখানে চোখ ঝলসে দিচ্ছে, যেখানে শত শত মণ পোলাও খিচড়ী পাকানো হচ্ছে, ভুরি ভোজনের আয়োজন যেখানে সরগরম হয় উঠছে, আতর গোলাপ ও সুগন্ধির যেখানে ছড়াছড়ি চলছে– সেখানে গেলে কি পরকালের কথা স্মরণ হবে? কখনই না। বরং পোলাও খিচড়ী খেয়ে এসে বলবে, বাপ্‌রে বাপ্‌– কি ধুমধামই না দেখলাম হুজুরের মাজারে। তা থেকে এক কাজ করুন। ঐ যে আপনার বাড়ীর পাশে, পুকুরের পারে, জঙ্গলের মাঝে, বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে, আম গাছের তলা, ডালিম গাছের নীচে, বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোনদের ও পাড়া-প্রতিবেশীর অনেকেই পুঁতে রেখেছেন ওখানে যান, কবরবাসীদের জন্য দু'আ করে পরকালকে স্মরণ করে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলে চলে আসুন– ফায়দা হবে। কিন্তু বাড়ীর পাশে বাপ-মা, দাদা-দাদী,

নানা-নানীর কবরটা যিয়ারত করার আগ্রহ আপনার অন্তরে একটা মুহূর্তের তরেও জাগলো না, আর টাকা পয়সা, মোরগ খাসী, চাল ডাল নিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মাজারে যাওয়ার আগ্রহটা ষোল আনার উপর বিশ আনা। জেনে রাখবেন, এতে নেকী বরবাদ গোনাহ্ লাযেম হয়ে যাচ্ছে।

এবার শুনুন কবর পাকা করার কথা। ইসলামী শরীয়তে কবর পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ বা ঘর নির্মাণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর নিজের কবরটাকে পাকা করে দিতে নিষেধ করেছেন। আর আলীকে পাকা কবরগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে বলেছিলেন। সুখের বিষয়, সৌদী আরবে পাকা বা উঁচু কবরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চৌদ্দশত বৎসর গত হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত আল্লাহর নবীর কবরটা পাকা করে দিতে কারো সাহস কুলায়নি। অথচ এই পীরভক্তরা পীরের মৃত্যুর পরে পরেই লেগে যায় তার কবরের উপর টাকা ঢালতে।

নবীগণ ছাড়া, যে কোন মানুষ মরে গেলে তার শরীর গলে পঁচে মাটিতে মিশে যায় এবং তার আত্মা কি অবস্থায় থাকে–আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় কবরকে পাকা করে দিয়ে, কবরের উপর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দিয়ে, শত শত মণ পোলাও খিচড়ী পাকিয়ে খেয়ে, কোনই লাভ নেই।

পাঠক আর একটা কথা চিন্তা করুন! এই যে কবরের উপর বাতি জ্বালানো হয়। ভক্তরা হাজার হাজার মোমবাতি নিয়ে যেয়ে কবরের উপর জ্বালিয়ে দেয়। এরূপ করার অর্থ কি? আমরা দেখি জীবিত লোকেরই অন্ধকার রাতে আলোর দরকার হয়। কোন গরীব মানুষের ঘরে আলো নেই, আপনি যদি তার ঘরে একটু আলোর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন– তো নিশ্চয়ই সে লোকটি উপকৃত হবে। কিন্তু যে লোক মরে যেয়ে মাটির তলে আছে, তার কবরের উপর বাতি জ্বেলে দিয়ে লাভটা কি? জীবন্ত ব্যক্তির ঐ মোমের বাতির জন্য সত্যিই কি মৃত ব্যক্তি তাকিয়ে থাকে? ঐ বাতির দ্বারা সত্যই কি সে উপকৃত হয়ে থাকে? তা যদি হয়, তাহলে বলব, পৌষ মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে দু'একখানা লেপ-তোষক দিয়ে

যেয়ে কবরটাকে ঢেকে দেয়ার দরকার। কিন্তু তাতো দেয়া হয় না; পীর ভক্তরা যদি বলে মৃত পীরের অন্য কোন জিনিসের দরকার নেই, কেবল আলো বাতির দরকার। তাহলে বলব, যেখানে মৃত ব্যক্তিকে শুয়ে দেয়া হয়েছে–সেই কবরের ভিতরে বাতি জ্বালানোর দরকার। কবরের উপর জ্বালালে তার লাভটা কি?

পীরের দরগায় বাতি জ্বালাতে নিষেধ করলে পীর ভক্তরা বলে, মসজিদে কেন বাতি জ্বালানো হয়? কিন্তু এই অন্ধ ভক্তরা একথা জানে না যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন– 'কবরকে মসজিদে পরিণত কর না'। তাহলে মসজিদের অনুকরণে কবরে বাতি জ্বালাতে হবে, একথা পীর পূজারীদের ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কি হতে পারে?

মসজিদ কেবলমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর জায়গা। সাধারণতঃ মাগরিব, এশা ও ফজরের সময় মসজিদে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন হয়। সাপ, বিচ্ছু ও পোকা-মাকর যদি থাকে–তা দেখে নেয়ার জন্য, নামাযের বিছানাগুলো ঠিক মতো বিছিয়ে নেয়ার জন্য, অন্ধকারে কে কোথায় নফল সুন্নাত পড়ছে তা দেখার জন্য, নামাযের কাতার ঠিক করে নেয়ার জন্য, মসজিদে বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন মিটে গেলে বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। কেননা অপব্যয় করা ইসলামে নিষেধ।

কিন্তু কবরে বাতি জ্বালাবার দরকার কি? সূর্য ডুবা মাত্র পীরের দরগায় বাতি জ্বালাতেই হবে। বাতি নিভানো চলবে না। সারা-সারারাত সেখানে বাতি জ্বলতেই থাকে। অনেক দরগায় বাতি জ্বালাবার জন্য জমি বা বেতন দিয়ে লোক রাখা হয়। কিন্তু কেন? দরকার তো এখানে মোটেই নেই। আছে কেবল একটা ভ্রান্ত ধারণা। সেটা হচ্ছে, কবরে যে পীর শুয়ে আছেন, বাতি জ্বালিয়ে উনার মনটা খুশী করতে পারলে, উনার মাধ্যমে দিলের মকসুদ পুরা হবে। কিন্তু এটা যে পীর ভক্তদের একটা কাল্পনিক অভিলাষ মাত্র, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অনেকের ধারণা, পীরের দরগায় শিরনী দিলে বালা মসিবত কেটে যাবে। কিন্তু এটাও তাদের ভ্রান্ত ধারণা। মনে করুন আপনার রোগ হয়েছে। আপনি পীরের দরগায় যেয়ে বললেন, বাব পীর সাহেব, আমি কঠিন রোগে ভুগছি,

আমাকে রোগমুক্ত কর। আমি তোমার দরগায় একটা মোটা-তাজা মোরগের গোশত ও পাঁচসের চাউলের পোলাও পাকিয়ে দিয়ে যাব। এটা তো ঠিক যে, অনেক রোগ আল্লাহর রহমে বিনা চিকিৎসায় সেরে যায়। আপনারও তাই হল। কিন্তু আপনার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ঐ কবরে শায়িত পীর সাহেব আপনার রোগ ভাল করে দিল। এ যেন ঠিক ঝড়ে কাক মরে– ফকিরের কারামতি বাড়ে'র মতো হয়ে গেল। নয় কি?

আপনার রোগ হয়েছে, চিকিৎসাও আপনি করাচ্ছেন। ওদিকে অধৈর্য হয়ে পীরের কাছে যেয়ে নজর নিয়াজ মানত করেও এলেন। আল্লাহর রহম ভাল ডাক্তারের চিকিৎসায় আপনার রোগ সেরে গেল। এখানেও ডাক্তারকে আপনি গুরুত্ব না দিয়ে পীরকেই গুরুত্ব দিয়ে শিরনী নিয়ে যেয়ে দরগায় হাজির হলেন।

আপনি মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। চিন্তায় চিন্তায় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তদবীরের জন্য ভাল উকিল-ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেছেন। ওদিকে দরগায় শিরনী মানত করে এলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে উকিলের প্রচেষ্টায় আপনি মামলায় জয়যুক্ত হলেন। ব্যাস আর যায় কোথা; বাড়ী এসে জোড়া খাসী ও চাউল ঘি নিয়ে ছুটলেন পীরের দরগায়। উকিলের উকালতির কোন গুরুত্বই দিলেন না আপনি। আর যদি রোগ ভাল না হয় বা মামলায় জয়ী না হতে পারেন, তাহলে ডাক্তার ও উকিলের দোষ দিয়ে থাকেন। তখন আর পীরের দোষ দেন না।

যা হোক, পীরের দরগায় নজর-নিয়াজ দিলে, পীরের দরগায় শিরনী বিতরণ করলে মানুষ উপকার পায় বলে যে দাবী করে থাকে– এর মূলে সত্যতা ও যুক্তির কোন লেশ মাত্র নেই।

আমি জনৈক পীরের খবর রাখি, যিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অমনি তার খানকায় লোকজনের যাতায়াত কমে গেল। কারণ রোগীর কাছে রোগীরা যেয়ে করবে কি? পীরের যখন রোগ দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন ভক্তদেরকে কেউ কেউ যেয়ে বলল, তোমাদের পীরের ভালভাবে চিকিৎসা করাও, তা না হলে পীর মারা যাবে। ভক্তরা বলল, খবরদার একথা বলো না। যে পীর মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক

সব রকমের রোগ ভাল করে থাকেন, তাঁর রোগ ভাল করার জন্য ঐ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে? পীরের বাহাদুরির উপর ঐ ডাক্তার এসে টেক্কা মারবে? –তা হতেই পারে না। শেষে দেখা গেল, খাওয়া-দাওয়া, সেবাযত্ন ও চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা কাহিল। তারপর একদিন তিনি ইন্তিকাল করলেন। ব্যাস, আর যায় কোথা; ভক্তরা চতুর্দিক থেকে ছুটতে আরম্ভ করল। খানকায় এসে কেউ কেউ কেঁদে গড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ হালুয়া নিয়ে এসে বিতরণ করল। কেউ কেউ ইট সিমেন্ট নিয়ে এসে কবর বাঁধিয়ে দিল। এখন ঐ পীরের কবরটা বিরাট এক মাজারে পরিণত হয়েছে। বছরে বছরে ওখানে ধুমধামের সাথে উরুসের মেলা বসানো হয়। হাজার হাজার মানুষ এসে ওখানে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানায়– নজর নিয়াজ মানৎ করে।

অবশ্য এ ধরনের দরগা শুধু একটা নয়, দেশের আনাচে-কানাচে খোঁজ করলে হাজার হাজার মিলবে।

এখন কথা হল এই যে, যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে নিজেকে রোগ থেকে বাঁচাতে পারল না, সে ব্যক্তি মরণের পর কবরে শুয়ে শুয়ে অপরের রোগ ভাল করবে কেমন করে? যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে নিজেকে মসিবত থেকে রক্ষা করতে পারল না, সে ব্যক্তি কেমন করে কবরে শুয়ে শুয়ে অপরকে মসিবত থেকে উদ্ধার করবে? যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে একটা পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পেল না, সে ব্যক্তি কেমন করে মরণের পর অপরকে পুত্রের মুখ দেখাবে? মানুষ যদি এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে চিন্তা করে, তাহলে সে কখনই দরগায় যেতে পারে না।

অনেক পীরভক্ত পীরের দরগায় উরুসের মেলা বসায় এবং নর-নারীর সেখানে একত্র সমাবেশ ঘটে; পর্দাপুশিদার কোন বালাই সেখানে থাকে না। আবার পীর ভক্তদের বিশেষ একটি শ্রেণী আলেক সাঁই বলে গাঁজায় কল্‌কেয় মারে টান! গাঁজার কল্‌কেয় টান মেলে নাকি তারা আল্লাহকে দেখতে পায়। তারপর গান-বাজনায় তারা বিভোর হয়ে যায়।

ইসলামে নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা যে হারাম, আর গাঁজা ও মাদকদ্রব্য যে হারাম, এ কথা প্রমাণের আর অপেক্ষা রাখে না। গান-বাজনা

সম্বন্ধে ঐ একই কথা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

আল্লাহর রসূল ﷺ আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই গান-বাজনার বিলোপ সাধনের জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরও বলেছেন, গান-বাজনা শুনা মহাপাপ, গান-বাজনার আসরে যোগদান করা ফাসিকী আর গান-বাজনা থেকে আনন্দ উপভোগ করা কুফরী কাজ। যে সব কবিতা পাঠ করলে আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ জেগে উঠে, সে সব কবিতা পাঠ করলে পরকালের চিন্তা এসে যায়, এরূপ ধরনের উচ্চাংশ কবিতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা বাদ্যযন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা নিষেধ নয়। কিন্তু দরগা পূজকরা শরীয়ত বিরোধী যে সব গান গেয়ে থাকে তা খুবই মর্মান্তিক। এসব ফকিরের দল তাদের কাজের সমর্থনে যে সব অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, তার কিঞ্চিৎ আভাষ আগে দিয়েছি। তারা বলে ত্রিশ পারা কুরআনের বাইরে আরও দশ পারা আছে এবং তা আমাদেরই সিনায় আছে। তারা আরও বলে, আল্লাহ তা'আলা ত্রিশ হাজার কথা মৌলবীদেরকে দিয়েছেন আর ষাট হাজার গোপন কথা আমাদেরকে দিয়েছেন। আর ঐ ষাট হাজার গোপন কথাই হচ্ছে আসল কথা। তাতেই নাকি আছে কবর পূজার কথা, উরুসের কথা, মেয়ে মরদ সব একত্রিত হওয়ার কথা, গান-বাজনার কথা, কবরকে সিজদা করার কথা, পীরের ধ্যান করার কথা।

তাই ঐসব ভক্তের দল নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ছেড়ে দিয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, ঢোলে তালি মেরে মেরে মাথা হিলিয়ে হিলিয়ে গান গায়–

নামায নামায কর মোল্লাজী
নামায কি চিনো?
পিছন দিকে খোদা থুইয়া
ডুম দেও ময়দানো

তারা আরও গায়–

শরা লইয়া হুড়াহুড়ি টের
পাইলেন না আলেমগণে
কিছু পাইলা ফকিরগণে
বাতেনের ভেদত পীরে জানে।

আর কেউ কেউ আল্লাহর সিফতের বর্ণনা দিতে যেয়ে ঢোলে তালি মেরে মেরে গাইতে থাকে–

লক্ষ কোটি সুরত নিয়ে
সাজলে তুমি নিরাকার
প্রভু, সাজলে তুমি নিরাকার।

অর্থাৎ তাদের মতে, আল্লাহর তার লক্ষ কোটি সৃষ্টির মধ্যে বিভক্ত হয়ে নিরাকার রূপে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। আল্লাহর পৃথক কোন অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই।

আবার তারা আল্লাহর উপর অভিযোগ পেশ করে গান ধরে–

আমি তোমার কলের গাড়ী
তুমি আমার ড্রাইভার
যদি তোমার ইচ্ছায় চলে গাড়ী
তবে দোষ কেন পড়ে আমার?

কত কথা আর বলব! এ ধরনের বহু গান তারা গেয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, জাহের বাতেনের ভ্রান্ত ধারণাটাই পীর পূজারীদেরকে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে। জেনে রাখা দরকার, ইসলামে গোপনীয়তার কোন নাম গন্ধ নেই।

দুনিয়ার কোন দেশের কোন বাদশাহ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কোন আইন তৈরী করলে, সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে তিনি তা জানিয়ে দেন। কখনই তা গোপন

রাখেন না। গোপন রেখে সেই আইন অমান্যকারীকে যদি শাস্তি দেন, তাহলে সেটা তার অন্যায় হবে। ঠিক সেরূপ সকল বাদশার বাদশাহ যিনি, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর আইনকে গোপন রাখতে পারেন না। কারণ যাকে আইনের কথা বলাই হলো না, একেবারে বাতেনে রাখা হলো, তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ত তলবের আর কি থাকতে পারে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাই বলেন,

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ *

"আমি তোমাদের মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনান, তোমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও উন্নত করে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, আর যে সব কথা তোমরা জানতে না, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেন। (সূরা আল-বাকারা ১৫১)

এখানে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর বিধি বিধান সম্পর্কে আমরা যা জানতাম না, তা জানিয়ে দেয়ার জন্য রসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। কোন কথা গোপন রাখার জন্য নয়।

তাহলে দশ' পারা বা ষাট হাজার কালাম গোপন আছে বলে পীররা যে দাবী করে থাকে, এটা তাদের শয়তানী ছাড়া আর কিছু না। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর রসূল ও তাঁর সাহাবাগণ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়েছেন। আর সেজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহর রসূল ﷺ যেভানে নামায পড়েছেন, ঐভাবেই পড়তে হবে। এ কথা বলা চলবে না যে, নামাযে আমি পাশ করে ফেলেছি, কাজেই আমাকে আর জামাআতে শরীক হতে হবে না বা রুকু-সিজদার সাথে নামায পড়তে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, যে ব্যক্তি রসূলের তরিকা মোতাবেক নামায পড়বে না, কুমিলা বিস্‌সায়কে– তাকে তলোয়ার দিয়ে কতল করে দিতে হবে, ওলা ইয়ুসাল্লা আলাইহি–তার জানাযা

পড়া হবে না, ওলা ইয়োদ্‌ফানু ফী মাকাবিরিল মুসলিমীন–আর মুসলমানদেরকে কবরস্থানে তার কবর দেয়া হবে না। অতএব যে আল্লাহর বান্দারা 'নামায নামায কর মোল্লাজী'– বলে ঠাট্টা করে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

তারপর 'লক্ষ কোটি সুরত নিয়ে সাজলে তুমি নিরাকার'– গানের মধ্যে ইসলামী তাওহীদের যে নামগন্ধ নেই, এটাও চিন্তা করার দরকার। আল্লাহ তাঁর লক্ষ কোটি সৃষ্টির মধ্যে বিভক্ত হয়ে নিরাকাররূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই–এ কথা আসলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অভিন্নবাদে প্রমাণিত হচ্ছে। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে স্রষ্টা বিভাজ্য হয়ে বিলীন হয়ে গেছেন–তাঁর আর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বও নেই। তাহলে যারা শঙ্করাচার্য্যের মতবাদে বিশ্বাসী, তাদেরকে কেমন করে মুসলমান বলা যেতে পারে, পাঠক একবার ভেবে দেখবেন।

এরপর 'আমি তোমার কলের গাড়ী তুমি আমার ড্রাইভার' এই গানের দিকে একবার লক্ষ্য করুন। এখানে দেহটাকে গাড়ী আর আল্লাহকে ড্রাইভার বানানো হয়েছে। কিন্তু ইসলাম তো তা বলে না। ইসলাম বলে দেহ ও আত্মা, দু'টোকেই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আত্মারূপ ড্রাইভার দেহরূপ গাড়ীকে পরিচালনা করে থাকে। আত্মারূপ ড্রাইভারকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহর দেহরূপ গাড়ী দান করেছেন। আত্মা কোন্ পথে কিভাবে গাড়ী চালনা করবে, তা জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে রসূল পাঠিয়েছেন। জেনে শুনে আত্মা যদি বদমায়েশী করে শয়তানী পথে গাড়ী পরিচালনা করে; তাহলে আত্মাকেই তার শাস্তি ভোগ করতে হবে– দেহকে নয়। তাহলে আল্লাহর দোষ দেয়াটা কুফরী ছাড়া আর কি হতে পারে?

আমরা হিন্দুদেরকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অশেষ পুণ্যের আশায় সারারাত জেগে হরি কীর্তন করতে দেখি। মুসলমানরাও যদি তেমনি মাজারে যেয়ে সারারাত জেগে গান-বাজনা ও উরুস করে– তাহলে হিন্দুদের হরি কীর্তন আর মুসলমানের উরুসের তফাৎ থাকল কোথায়? হিন্দুরা যেমন প্রতিমার সামনে বা ঠাকুর থানে নৈবেদ্য বলি বা ভোগ দিয়ে সেটাকে প্রসাদরূপে বণ্টন করে খায়– মনের

আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায়, ঠিক সেরূপ মুসলমানরাও যদি মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় খানকা বা মাজারে যেয়ে নজর-নিয়াজ দিয়ে সেই শিরনী বিতরণ করাকে নিয়ত পূরণের মাধ্যম বলে বিশ্বাস করে– তাহলে হিন্দুদের নৈবেদ্য, বলি, ভোগ ও প্রসাদের মধ্যে আর মুসলমানদের নজর-নিয়াজ ও তাবার্‌রুকের মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায়? হিন্দুরা যেমন ঠাকুর থানে বা প্রতিমার সামনে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ঠিক সেরূপ মুসলমানরা যদি পীর বা পীরের কবরকে সিজদা করে, তাহলে মূর্তিপূজারীদের আর মুসলমানদের পীর বা কবর পূজার মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়?

ইসলাম এসেছে শির্কের পঙ্কিল পাঁকে নিমজ্জিত মানুষকে তাওহীদের ঝর্ণা ধারায় নির্মল করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পীরি মুরীদির কারবার মানুষকে কবরপূজার মতো শির্কের এই পঙ্কিলখাদে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই মহাব্যাধি থেকে রক্ষা করুন– এই প্রার্থনা করি।

পীরেরা শির্কের প্রশ্রয় দিচ্ছেন

এমন অনেক পীর আছেন যারা নিজেদের শরীয়ত ও মারেফত পন্থী বলে দাবী করেন। সুন্নাতী লেবাস ব্যবহার করেন। কুরআন হাদীসও কিছু জানেন। নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত সবই ঠিক রেখেছেন। কথায় কথায় কুরআনের আয়াত ও বুজুরগানে দীনের কথা আওড়িয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সাংঘাতিক ভাবে শির্কের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন।

এ ধরনের পীরকে যদি সিজদা সম্পর্কে বলা হয় যে, বলুনতো, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা চলবে কিনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবেন না আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা চলবে না। আবার পীর সাহেব যখন মুরীদবাড়ী যান, তখন দেখি পা দু'টো লম্বা করে দিয়েছেন কদমবুছি লওয়ার জন্য। সত্যই কি ভক্তরা কদমবুছি নেয়ার জন্য। সত্যই কি ভক্তরা কদমবুছি করে থাকে? ভক্তি গদ গদ হয়ে পড়ে যায় তারা সিজদায়। কেউবা পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুষতে থাকে। তখন

যদি জিজ্ঞেস করা যায় পীর সাহেবকে– এসব আবার কি? তখন তিনি বলেন, এই সব আহাম্মকের দল, মানা করলে শুনে না কি করি বলুন।

কি করি বলুন? কেন? তুমি পীর। তোমার সব কথা ওরা শুনে। আর আমার পায়ে সিজদা করো না, আমার পা চেটো না, বললে ওরা শুনবে না কেন? যদি না শুনে, জোরসে এক লাথি মেরে দিলেই হয়।

এ ধরনের পীররা খাস এক মজলিসে ভক্তদেরকে বসিয়ে বলেন, বাবারা, আমার প্রতি তোমাদের কেমন মহব্বত তা আজ পরীক্ষা করব। আচ্ছা বাবারা বলতো-আমি মারা গেলে তোমরা কে কে প্রতি বছর আমার নামে উরুস করবে? একবার হাত উঠিয়ে ওয়াদা করতো দেখি। ভক্তরা তখন হাত উঠিয়ে ওয়াদা করে। কেউ কেউ বলে হুজুর , যতদিন বেঁচে থাকব, প্রতি বছর গরু জবাই করে আপনার নামে উরুস করব। কেউ কেউ বলে হুজুর, যতদিন বেঁচে থাকব, প্রতি বছর আপনার নামে খাসী বা মোরগ জবাই করে শিরনী বিতরণ করব। দিনাজপুরের একজন পীর ভক্ত আমাদের কাছে খুবই আসা যাওয়া ও উঠা বসা করতেন। তিনি প্রায়ই গল্প করতেন, তাদের পীরের ঐরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে।

কোন কোন জাঁদরেল পীরের ইন্তেকালের পর দেখা যায় তাঁদের ছেলেরা কেউ বড় হুজুর, কেউ মেজ হুজুর, কেউ সেজ হুজুর, কেউ ছোট হুজুর, কেউ 'ল' হুজুর সেজে বাপের কবরটাকে বাঁধিয়ে দিয়ে বছরে বছরে ইসালে সওয়াবের মেলা বসাতে শুরু করে দিলেন। লাখ লাখ টাকার আমদানী সেখানে হতে লাগলো। শত শত মণ শিরণী সেখানে পাকানো হতে লাগলো। ভক্তরা সব পাঁচশ' হাত দূরে জুতা খুলে রেখে কবরের কাছে যেয়ে কেঁদে জারেজার হয়ে যায়। কেউবা একটু মাথা ঝুকায়, কেউবা মনোবঞ্ছা পূরণের অনেক কিছু আবেদন নিবেদন পেশ করে। তারপর চলে আসার সময় কবরের কাছ থেকে পিছু হটে হটে চলে যায়। এসব ঘটনা গদ্দীনশীনদের চোখের সামনে ঘটে থাকে।

পাঠকগণ একবার মদিনা মুনাওয়ারার দিকে লক্ষ্য করুন। যেখানে আপনার আমার প্রিয় রসূল সাইয়েদুল মুরসালীন দোজাহানের নবী শুয়ে আছেন সেখানে তো উরুসের মেলা বসে না হাজার হাজার মণ শিরনী তো বিতরণ হয়না

পাঁচশ' হাত দূরে জুতা খুলে রেখে কেউ তো কবর যিয়ারতে যায় না হাত জোড় করে কেউ তো পিছু হটে হটে যায় না; কেউ তো মাথা নোয়ায় না। বরং সেখানে পুলিশ পাহারা আছে। এ দেশের মাটিতে পীরদের মাজারে যে সব কাণ্ড হচ্ছে এসব যদি ওখানে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে দু'চার ডাণ্ডা উত্তম মধ্যম মিলে যাবে। তাই বলি, শির্কের প্রশ্রয় পীর সাহেবরাই দিচ্ছেন। অনেক পীর কথা যা বলেন-খাসা কথা। ব্যবহারও খুব মোলায়েম। কিন্তু মুরীদদেরকে তালিম দেয়ার সময় বলেন, বাবারা, চোখ বন্ধ করে একটা জবা ফুলের ধ্যান করুন। কেউ বলেন চোখ বন্ধ করে আপনাদের পীরের ধ্যান করুন। এভাবে পীর বা ফুলের ধ্যান করতে করতে আপনার আল্লাহকে পাবেন।

পাঠক এখানে চিন্তা করুন, যদি পীর বা ফুলের ধ্যান করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়, তাহলে যারা মুক্তির ধ্যান করতে করতে ভগবানকে লাভ করে, তাদের মধ্যে আর ইনাদের মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায়? তাছাড়া কুরআন হাদীসের কোন জায়গায় কি লেখা আছে যে, পীর বা ফুলের ধ্যান করতে করতে আল্লার ধ্যান এসে যাবে? আল্লার রসূল ﷺ কি সাহাবাদেরকে এভাবে তালিম দিয়েছিলেন? এক ভদ্রলোক নুতন পীর সেজেছেন। নুতন নুতন ভক্তদের কাছ থেকে আর উরুসের মেলা টেলা দু'একটা বসিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নিজস্ব পছন্দসই একটা খানকা শরীফও বানিয়ে নিয়েছেন শুনলাম। তিনি একটা লাশের মাটি দিতে যেয়ে কবরের একমুঠো মাটি নিয়ে উদ্ভট এক চীৎকার করে মাটিকে হুকুম করে বললেন, এ মাটি শোন্ খবরদার তুই এই লাশকে শাস্তি দিস না। এই বলে তিনি মাটিটুকু নিয়ে কবরের মধ্যে রেখে দিলেন। নুতন পীরের এই কণ্ড দেখে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, একি, মাটি কি আজাব করে নাকি? আযাবের মালিক তো আল্লাহ। তাহলে পীরের মুখ থেকে এহেন শির্কের কথা বের হয় কেমন করে?

মোট কথা, মানুষ হয়ে মানুষের ধ্যান করা, জীবন্ত বা মৃত মানুষের কাছে নত হওয়া, সৃষ্টিকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী মনে করা প্রভৃতি শিরকের কাজের প্রশ্রয় পীর সাহেবরাই দিচ্ছেন। আল্লাহ এ অভিশাপ থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করুন।

কাল্পনিক পীরের ছড়াছড়ি

পীর ভক্তরা পীর মানতে মানতে এমন দরজায় পৌঁছে গেছে যে, পীর সাহেব প্রশ্রাব ফিরে কুলুখ করে মাটির ঢেলাটা যেখানে ফেলে দিলেন সেই জায়গাটাকে বানিয়ে নিলেন ঢেলাপীরের আস্তানা। ঢেলাপীর বলতে হুজুরের ঐ এস্তেঞ্জার ঢেলা। ছোট বেলার কথা আজও মনে পড়ে। তখন বর্ধমানের মঙ্গলকোটে পড়তাম। ছুটির দিনে সাথী-সঙ্গীদের সাথে বেড়াতে বের হয়েছি। জানি না যে, সামনে ঢেলাপীর আছে। সঙ্গীদের কেউ কেউ ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ঢেলাপীরের আস্তানায় মেরে দিল। বললাম, আচ্ছা ভাই এখানে ঢেলা মারছো কেন? বলল, জান না এটা ঢেলাপীরের আস্তানা? সামনে পরীক্ষা, ঢেলা মারলে ঢেলাপীর ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করিয়ে দিবে। তখন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার মত অত জ্ঞান আমার হয়নি, কাজেই চুপ থেকে গেলাম। তারপর এ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে বিশ পঁচিশ জায়গায় ঢেলাপীরের আস্তানা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।

যেখানে সেখানে ঘোড়াপীরের আস্তানা দেখা যায়। আমার গ্রামেই এক ঘোড়াপীরের আস্তানা ছিল। ছোট ছোট মাটির ঘোড়া এক আনায় তখন তিনটা করে পাওয়া যেত। ঐ ঘোড়া নিয়ে এসে পীর ভক্তরা ঐ তেতুল গাছের নীচে ঘোড়াপীরের আস্তানায় দিয়ে যেত। কিভাবে যে ঘোড়াপীরের আস্তানা গড়ে উঠেছিল, জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলতে পারেন না। তবে কেউ কেউ বলেন পীর সাহেবের ঘোড়াটা এখানে মারা গিয়েছিল এবং এখানেই সেই ঘোড়াটাকে পুঁতে রাখা হয়েছে বলে, এখানে ঘোড়াপীরের আস্তানা গড়ে উঠেছে। এভাবেই দেশে শত শত ঘোড়াপীরের আস্তানা গড়ে উঠেছে। পীর ভক্তরা যেয়ে পীরের মরা গোড়ার কবরে মানৎ করে, নজর-নিয়াজ দেয়, দিলের মকসুদ পূরণের জন্য আকুল ফরিয়াদ জানায়। মানুষ সাধারণতঃ কাঠ, বাঁশ বা বেতের ছড়ি ব্যবহার করে থাকে এবং অকেজো হয়ে গেলে চুলায় পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু পীর ভক্তরা পীরের এন্তিকালের পর তার অকেজো লাঠিটাকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে সেটাকে লাঠি পীরের আস্তানা বানিয়ে নেয়। কলকাতায় থাকতে বাটানগর এলাকায় এক

লাঠি পীরের আস্তানা দেখার সুযোগ হয়েছিল। বাতের রোগীরা প্রতি বৃহস্পতিবারে লাঠি পীরের দরগায় যায় শিরনী নিয়ে। আর করজোড়ে বলে বাবা লাঠিপীর আর সইতে পারি না– বাত থেকে বাঁচাও।

জামাপীর, পুপিপীর অবশ্য নজরে পড়েনি। তবে লোটাপীর, ধোকরাপীর, তেনাপীর ও জুতাপীরের দরগা দেখার সুযোগ হয়েছে। অনেকদিন আগে মালদহ থেকে বুনিয়াদপুর যেতে উনিশ মাইলের মাথায় একটা গাছের শাখায় শাখায় তেনা ঝুলতে দেখে মালদহের প্রখ্যাত বক্তা মাওলানা কাবাতুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ আবার কি? তিনি বলেছিলেন এটা হচ্ছে তেনাপীরের আস্তানা। তারপর কর্ম জীবনের এ পর্যন্ত শতাধিক তেনাপীরের আস্তানা দেখার সুযোগ পেয়েছি। দিলের মকসুদ পূরণের জন্য পীর ভক্তরা গাছের ডালে ডালে তেনা বেঁধে দিয়ে আসে। পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানে জুতাপীরের খানকা শরীফ দেখেছি। শুনা যায় কাটোয়া টাউনের এক পীর তার এক ভক্তকে জুতা ছুড়ে মেরেছিল। ভক্ত জুতাটা কুড়িয়ে নিয়ে, মিল্‌গিয়া- মিল্‌গিয়া বলে দিল এক দৌড়। এক দৌড়ে চল্লিশ মাইল দূরে বর্ধমান যেয়ে হাজির। সেখানে হাজির হয়ে জুতাটায় ভালভাবে তেল সিঁদুর মাখিয়ে ঝাণ্ডা গেরে দিয়ে জুতা পীরের আস্তানা বানিয়ে নিলো। পীর ভক্তরা দলে দলে সেখানে যেয়ে জুতায় পয়সা দিয়ে সালাম করে ও শিরনী বিতরণ করে, আর দিলের আকাঙ্খা পূরণের জন্য জুতা পীরের কাছে কাকুতি মিনতি জানায়।

পাঁচপীরের আস্তানা অনেক জায়গায় দেখেছি। এই কাল্পনিক পীরের আস্তানায় দলে দলে ভক্তরা যায় মানত করতে। যে সব মেয়ে পাঁচ পীরের আস্তানায় ছেলে চাইতে যায়, আল্লাহর হুকুমে তাদের ছেলে মেয়ে হলে তারা মনে করে ঐ পাঁচপীর তাদেরকে ছেলে দিয়েছে। তাই তারা পাঁচপীরের নামের বরকরেতর আশায় ছেলের নাম রাখে পাঁচু, পাঁচাই, পাঁচকড়ি, পেঁচো, পঁচা, পঞ্চানন, পাঁচুয়া প্রভৃতি।

যেখানে সেখানে কুমীর পীরের দরগা দেখা যায়। রাজশাহীর উজিরপুরে কুমীর পীরের দরগা আছে। পাওয়াতেও কুমীর পীরের পূজা হতো। পুকুরে একটা কুমীর থাকতো। পীরভক্তরা মোরগ নিয়ে যেয়ে খাদেম সাহেবের হাতে দিত।

খাদেম সাহেব ভক্তের সামনেই মোরগটাকে পানিতে ডুবিয়ে পুকুরের মাঝখানে ছুড়ে দিত। আর বলত বাবা কুমীর পীর কবুল করো। অমনি কুমীর হপ করে মোরগটাকে গিলে ফেলত। আর মোরগটা যদি বেশ মোটাতাজা ও লোভনীয় হোত, তাহলে খাদেম সাহেব ভালভাবে তাকে না ডুবিয়ে খুব জোরে ছুড়ে দিত, যাতে পানির মাঝখানে না পড়ে-ওপারে যেয়ে পড়ে। মোরগ উড়ে যেয়ে যখন ওপারে পড়তো, তখন খাদেম সাহেব ভক্তকে বলত, বাবা এবারে হুজুর তোমার মানৎ কবুল করলেন না। আগামীতে একজোড়া নিয়ে এসো। এই বলে খাদেম সাহেব মোরগটাকে ধরে নিজের জন্য রেখে দিত। বর্তমানে উজিরপুরের পুকুরেও কুমীর নেই আর পাঙ্গুয়ার পুকুরেও কুমীর নেই, কিন্তু কুমীর পীরের দরগা ও ভক্ত যথেষ্ট আছে।

চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর কবর আছে। আর সেখানে পুকুরের পানিতে অনেকগুলো কচ্ছপ আছে। পীর ভক্তরা ঐ কাছিমগুলোকে অত্যধিক সম্মান দিয়ে থাকে। কেবল কাছিম হুজুর কেবলাদের জন্য সেখানে খাবারের দোকানের মেলা বসে আছে। ভক্তরা খাবার কিনে নিয়ে হুজুরদেরকে খাওয়ায়। খাবারের লোভে কাছিম হুজুররা কাছে এলে ভক্তরা কাছিমের পিঠের পানি নিয়ে খায়, মাখে– অনেকে আবার শিশিতে পুরে বাড়ী নিয়ে যায়। এসব পীরবক্তদের কাছে এ পানির তুলনায় আবে জমজমের যেন কোন মূল্যই নেই। বলাবাহুল্য এই কাছিমপীরের ভক্ত বাংলাদেশে নেহায়েত কম নয়।

তারপর সত্যপীর, পীর মুসাফির, ফড়িং পীর, দরিয়াপীর, সাগর পীর, সোহাগী পীর, বনপীর প্রভৃতি কাল্পনিক পীরের আস্তানা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এসব আস্তানায় মানুষ অন্ধ হয়ে নজর নিয়াজ দিয়ে থাকে। পীরকে ভক্তি করতে করতে পীর ভক্তরা শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে– পাঠক একবার চিন্তা করুন।

অনেক জায়গায় দেখি কৃত্রিম কবর তৈরী করে পীরভক্তরা তার পূজা শুরু করে দিয়েছে। আমাদের দেশে কৃত্রিম কবর খোঁজ করলে অনেক মিলবে। শুধু ইমাম হোসেন রাযিআল্লাহু আনহুর কবরের সংখ্যা কি কম আছে।

কবর পাকা করা যদিও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তবু আমরা যেখানে সেখানে বহু পাকা কবর দেখতে পাই। কেউবা নিবিড় স্নেহের আতিশয্যে তার ছেলের কবর বাঁধিয়েছে; কেউবা গভীর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তার স্ত্রীর কবর বাঁধিয়ে দিয়েছে, কেউবা অতি ভক্তির আতিশয্যে তার পীরের কবর বাঁধিয়ে দিয়েছে' এভাবে ব্যাপক আকারে কবর পাকা করা শুরু করে দিলে এই দুনিয়াটা যে কবরের দ্বারা ব্লক হয়ে যাবে এবং মানুষের আবাদের যে একেবারে অনুপযোগী হয়ে যাবে– সে কথা চিন্তা করে কে?

যাক, এখন কথা হচ্ছে, জঙ্গল সাফ্ করতে করতে দু' পাঁচশ' বছর আগের একটা পাকা কবর পাওয়া গেল বলে, সেটাকে কি ওলী আল্লাহর কবর মনে করে তার পূজা আরম্ভ করে দিতে হবে? কিন্তু হচ্ছে তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিনাজপুরের চেহেল গাজীর কবরের কথাটা চিন্তা করুন। জঙ্গল সাফ্ করতে করতে দেখা গেল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত লম্বা একটা পাকা কবর। বাস আর যায় কোথা, চারিদিক ঘিরে দেওয়া হলো। তারপর মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে স্থির করা হলো এটা চেহেলগাজীর কবর। কবরের উন্নতির জন্য রাস্তার ধারে পয়সা নেয়ার জন্য লোহার সিন্দুক রাখা হলো। বহু টাকা-পয়সার আমদানী হতে লাগলো। কবরের উপর ছাদ তৈরী করা হলো। মনোরম গেট তৈরী করা হলো। বছরে বছরে বার্ষিক উরসের মেলা বসানোরও ব্যবস্থা করা হলো। এখন মাজারে জৌলুস দেখলে চক্ষু স্থির হয়ে যায়।

চেহেল ফার্সী শব্দ। চেহেল মানে চল্লিশ, আর ধর্মযুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাঁরা জয়যুক্ত হন, তাদেরকে বলা হয় গাজী। তাহলে ধর্মযুদ্ধে জয়যুক্ত চল্লিশজন বীর যোদ্ধাকে বলা হয়– 'চেহেল গাজী'। এই চেহেল গাজী, একটা কবরে ঢুকলেন কেমন করে তা, আমাদের আক্কেলে কাজ করে না। যিনি মাথা খাটিয়ে কবরটাকে চেহেল গাজীর কবর বলে প্রচার করেছন, তিনি যদি চেহেল শহীদের কবর বলে ওটাকে প্রচার করতন, তাহলে বুদ্ধিটা কিছুটা খাপ খেয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়নি। বুঝা যাচ্ছে ভদ্র লোকের বুদ্ধি চিকন কিন্তু হুশে মোটা। যাক, এখন ঐ চেহেলগাজী যে কারা, তার কোন ইতিহাস নেই। যারা এ সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছেন, তারা অনুমানের উপর অনুমান আর কল্পনার উপর কল্পনা করেই কিছু বলেছেন।

এভাবে বাংলার মাটিতে কত যে কবর আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই সব কবর সম্পর্কে কত যে কল্পনার জাল রচনা করা হয়েছে– তার ইয়ত্তা নেই। আর এগুলোই হচ্ছে বর্তমানে পীর-পূজারীদের ইসলাম। পাঠক যদি নিরপেক্ষভাবে একটু চিন্তা করেন তাহলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন, এসবের 'ফাউনটেন হেড' অর্থাৎ উৎস হচ্ছে ঐ পীরি-মুরিদীর কারবার।

প্রার্থনা করি আল্লাহর দরবারে, হে আল্লাহ! তুমি এসব শির্ক থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।

পীরতন্ত্র মানুষকে 'গওস' বানিয়েছে

পীরভক্তরা কোন কোন পীরকে 'গওস' নামে অভিহিত করে থাকে। কেবল তাই নয়, শায়খুল-মাশায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীকে অনেকে গওসুস্-সাকালায়িন বলে আখ্যাত করে থাকে।

'গওস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, বিপদআপদ থেকে মুক্তকারী ও উদ্ধারকারী। সাকালায়িন মানে জিন ও ইনসান। গওসুস্-সাকালায়িন মানে মানব ও দানবের আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মানব ও দানবের বিপদহন্তা ও উদ্ধারকারী।

যেখানে তাওহীদের মূল শিক্ষাই হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা, বিপদহন্তা ও আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী কেউ নেই, সেখানে পাঠক একবার চিন্তা করুন, মানুষ কেমন করে এসব গুণের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু পীরভক্তরা আল্লাহর এসব গুণে মানুষের অধিকারী সাব্যস্ত করে ছেড়েছে।

পীরদের কিতাবে লেখা আছে, সমস্ত জীবজন্তু যাঁর মাধ্যমে সাহায্য ও আহার পায়, এমনকি ফেরেশ্তাগণও যাঁর মাধ্যমে সাহায্য পায়, তাঁকেই বলা হয় 'গওস'। পীরদর কিতাবে আরও লেখা আছে, পৃথিবীতে তিনশ' উনিশজন নজির আছেন, তন্মধ্যে সত্তরজন নকিব আছেন, আওতাদ্দের মধ্যে একজন 'গওস' আছেন। দুনিয়াতে যুদ্ধবিগ্রহ, খাদ্য সংকট, অশান্তি ও মহামারী দেখা দিলে

তামাম জীবজন্তুর প্রতিনিধি তিনশ' উনিশজন নজিবের কাছে ছুটে যান, নজিবরা তখন সত্তরজন নকিবের কাছে ফরিয়াদ জানান, সত্তরজন নকিব তখন চল্লিশজন আব্দালের কাছে আবেদন পেশ করেন, চল্লিশজন আব্দাল তখন সাতজন কুতুবের দ্বারস্থ হন, সাতজন কুতুব তখন চারজন আওতাদের কাছে দৌড়ে যান, চারজন আওতাদ তখন 'গওস'-এর কাছে সাহায্যের জন্য আকুল ফরিয়াদ পেশ করেন, 'গাওস' তখন সব সমস্যার সমাধান করে দেন।

'গওস' সম্পর্কে এই যে ধারণা, খৃষ্টানরা ঠিক ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে থাকে, আর সীমালঙ্ঘনকারী রাফেযীরা আলী সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে।

কোন মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, কুরআন ও হাদীস মতে শির্ক– এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহই হচ্ছেন অন্নদাতা, আল্লাহই হচ্ছেন বিপদমুক্তকারী, আল্লাহই হচ্ছেন আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, আল্লাহ হচ্ছেন সরাসরি সাহায্যকারী, এক কথায় আল্লাহই হচ্ছেন 'গওস'

নজিব, নকিব, আব্দুল, কুতুব, আওতাদ ও 'গওস' প্রভৃতি কথা কুরআন ও হাদীসের কোন জায়গায় উল্লেখ নেই। পীর ও পীরভক্তদের এই প্রমাণহীন ধারণা ও উক্তি সম্পর্কে ইমাম ইবনু তায়িমিয়া বলেছেন– "هذا كله باطل" গওস, কুতুব সম্পর্কে যত কথা সবই বাতিল। "لا اصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله' আল্লাহর কিতাবে ও তাঁর রাসূলের সুন্নতে এ সবের কোনই প্রমাণ নেই। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ এমন কথা বলেননি। মহামতি ইমামগণ যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম সওরী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম জহরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী (রহ.), প্রভৃতি কেউ একথা মুখে উচ্চারণ করেননি। বড় বড় শাইখগণ, যেমন জুনায়েদ বাগদাদী, হাসান বসরী, ইবরাহীম বিন আদহাম, মারুফ কর্খী ও আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ইনারাও কেউ এসব কথা বলেননি। হাদীস শাস্ত্র-বিশারদগণের কেউই এ মর্মের কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেননি। আল্লাহর রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি

আমার নামে হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, এ কথা আল্লাহর নবী বলেননি, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। এই জন্য বলা হয় তিনটি জিনিষ মিথ্যা– (১) নাছিরীদের তোরণ (২) রাফেজীদের প্রতীক্ষ্যমান, (৩) মুর্খদের 'গওস'। একদল পীর এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, গওস ও কুতুব যিনি– তিনি আল্লাহর ওলীদের সাহায্য করেন আর তাদেরকে তিনি ভালভাবে চিনেন। বলাবাহুল্য– এ ধারণাও বাতিল। কোন মানুষেকে গওস কুতুব বলা বিদ'আত– আল্লাহর আদেশের খিলাফ। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামগণ কোন কথাই বলেননি। (ফতোয়া ইবনু তায়মিয়াহ)

মোটকথা পীরতন্ত্র এমন এক আজব চিজ যা মানুষকে 'গওস' বানিয়ে একেবারে আল্লাহর আসনে বসিয়ে ছেড়েছে।

সব পীরের এক বুলি

পীর আলেম হোক আর জাহেল হোক, সুন্নাতি লেবাস পরিহিত হোক আর কুপ্পী আঁটা হোক, মাথায় পাগড়ী বাঁধা হোক আর জটাধারী হোক, নামাযী হোক, আর বেনামাযী হোক, যার কাছে যাবেন একই বুলি শুনতে পাবেন। সে বুলি হলো, "বাবারা আজকাল যেমন তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে ভেজাল, লবনে ভেজাল, গুড়ে ভেজাল, দুধে ভেজাল ঢুকেছে ঠিক তেমনি বাবারা পীরেও ভেজাল ঢুকেছে। অতএব বাবারা বুঝে-সুজে পীর ধরবেন।" অর্থাৎ কিনা যখন যার কাছে যাবেন তখনই তিনি নিজের দিকেই ইঙ্গিত করবেন যে, বাবারা আমিই কামেল পীর আমার কাছেই মুরীদ হও। অথচ আমরা দেখতে পাই এক পীরের সাথে আর এক পীরের মিল নেই। যত পীর তত প্লাটফরম। যত পীর তত দল। এক কথায় বলতে গেলে পীরতন্ত্রই মুসলিম সমাজের একতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। ধর্মপ্রাণ লোক চায় পথের সন্ধান। কিন্তু যার কাছে যায় তিনিই তো বলেন বুঝে সুঝে পীর ধর, মানে নিজের দিকেই ইঙ্গিত করেন, এখন উপায়টা কি?

অনেকে বলেন, যে পীরের মরিদানদের মধ্যে আলেমের সংখ্যা বেশী সেই পীরই কামেল পীর। কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেক দলেই কম হোক আর বেশী হোক আলেম আছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, যে সব পীরের দলে আলেমের সংখ্যা বেশী, সে সব পীর কেবলাদের আলেম তৈরীর কারখানাই আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি শান্তি নিকেতনে যারা পড়ে, তাদের কাছে সব সময় প্রফেসররা কবিগুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং ছাত্ররা যাতে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। পরে দেখা যায় স্বভাবতঃই ছেলেরা লেখাপড়া শিখে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গেছে। ঠিক সেরূপ যেসব পীর কেবলা বড় বড় মাদ্রাসা কায়েম করেছেন, সে সব মাদ্রাসায় যারা শিক্ষকতা করেন, তাঁদেরকে পীর সাহেবের অন্ধভক্ত হতে হয়। তা না হলে তাদের চাকুরী থাকে না। ঐসব মাদ্রাসায় যে সব ছেলেরা পড়তে যায়, প্রথম থেকেই তাদেরকে পীরের অন্ধভক্ত বানাবার চেষ্ট করা হয়। কথায় কথায় শিক্ষকগণ ছাত্রদের সামনে পীর কেবলার মাহাত্ম্য, গুণগরিমা ও কারামতির কথা জাহির করেন। ফলে দেখা যায় ছেলেরা আস্তে আস্তে পীরের অন্ধভক্ত হয়ে গেছে এবং মৌলবী হয়ে পীর কেবলার দালালী শুরু করে দিয়েছেন। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে মুক্তমন নিয়ে চিন্তা করার মাথা তারা খেয়ে ফেলেছেন। যে পীরের মাদ্রাসায় যিনি পড়েছেন, সে পীর ছাড়া তিনি আর কিছুই বুঝেন না। যিনি যে পীরের মাদ্রাসায় পড়ে এসেছেন, তাঁর বোল-চাল, কথা-বার্তা, হাবভাব ও চাল-চলনের দিকে লক্ষ্য করলেই–

প্রিয় পাঠক! আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। অনেক মৌলবী সাহেব পীর হওয়ার লোভ সামলাতে পারেন না। দেখেন যে এই এলাকায় পীরি-মুরীদি করার একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু হাঠৎ পীর বলে দাবী করলে তো কেউ মানতে চাইবে না। তখন করেন কি, কোন এক জাদরেল পীরের খলিফা বলে নিজেকে জাহির করেন। তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে লোক টোপ গিলতে শুরু করেছে। কাজেই এই শ্রেণীর আলেমদের প্রপাগাণ্ডায় গলে যেয়ে পীরের অন্ধভক্ত হতে হবে বা পীরি-মুরীদির কারবারকে সমর্থন করতে হবে– এটা কোন কথা না।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, শায়খুল মাশায়েখ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, যে হকিকত ও মারেফতের পিছনে শরীয়তের সমর্থন নেই, সে হকিকত ও মারেফত কুফর। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে পীরি-মুরীদির কারবারের কথা ইসলামের কথা কিনা? এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে, পীর শব্দটার অস্তিত্বই ইসলামে নেই। সাহাবা, তাবেঈ ও মহামতি ইমামদের কেউ পীরি-মুরীদি করেননি। অভিনব এক ভঙ্গিমায় বিকট চীৎকার করে যিক্‌র করার কথাও ইসলামে নেই। ঐ যে ছাগল, গরু, চাল, ডাল, ঘি মোরগ তলব করে উরুস পালন করা হয় এরও কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। মানুষকে পাপমুক্ত করে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়ার দাবীও পীরদের ভিত্তিহীন। ওসীলা হওয়ার দাবীও তাদের ঝুটা।

তারপর যে সব পীর বলে দশপারা গুপ্ত কুরান আছে, ষাট হাজার গোপন কথা আছে, জটা রাখতে হবে, নখ ও নাভির নীচে চুল রাখতে হবে, গাঁজা সিগারেট, হুককা, বিড়ি খেতে হবে, সব সময় পীরের ধ্যান করতে হবে– এরা যে চরম কুফরী করছে, তাও আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব আমি সমাজের প্রতেকের কাছে অনুরোধ করবো, যখনই কোন পীর আপনাদেরকে বলবেন যে, বাবারা তেলে ভেজাল , গুড়ে ভেজাল– তেমনি পীরেও ভেজাল। অতএব বুঝে সুঝে পীর ধরবেন। তখনই আপনার বলবেন যে, বাবা পীর সাহেব, শ্বাশত সনাতন ইসলামে পীরতন্ত্রটাই তো একটা ভেজাল– সেই ভেজালে আবার আমাদেরকে ঢুকতে বলেন কেন? যে সর্ষে পড়ায় ভুত ছাড়াবে, সেই সর্ষেতেই তো ভুত আসর হয়ে বসে আছে। তো ভুত ছাড়াবে কে?

শেষ কথা

আপনার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, পীর বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি প্রভৃতি আল্লাহর ওলীরা কেউ কোন দিন পীরগিরি করেননি আর ফরি ধরা ফরয, সুন্নাত,

নফল- কিছুই না। যারা মনে করেন পীর না ধরলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না, তাঁদেরকে বলবো ঐ দেখুন আল্লাহ তাঁর কালাম পাকে কি বলছেন। আল্লাহকে পেতে হলে তাঁর ইবাদতের তরিকা ও তাঁর রসূলের সুন্নাতের বিধান জানার জন্য বিদ্যা শিখতে হবে ও বিদ্বানদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এই শিক্ষা ও জিজ্ঞেস করা আমাদের উপর ফরয।

আল্লাহ সূরা নাহল ৪৩ নং আয়াতে বলেন ঃ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ *

অর্থাৎ তোমরা যা জান না তা জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের বিদ্যায় পারদর্শী ধর্মপরায়ণ বিদ্বানদেরকে জিজ্ঞেস করো। যারা কুআন ও হাদীসের বিদ্যায় গভীর জ্ঞান রাখেন এবং সেই মুতাবেক আমল করেন, তাদেরকেই বলা হয় আহলে যিক্‌র। কোন ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে অমান্য করে অথবা বাতেনী বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে অথবা যোগসাধনা করে মহাপণ্ডিত হতে পারেন, বিদ্যাসগর হতে পারেন, সুফী হতে পারেন, দরবেশ হতে পারেন, পীর হতে পারেন, পুরোহিত হতে পারেন, প্রীষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আহলে যিক্‌র হতে পারেন না। আর আহলে যিক্‌র ছাড়া আল্লাহর ইবাদতের তরিকা ও সুন্নাতের বিধান শিক্ষা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব না। অতএব এ ব্যাপারে কোন পীর, পুরোহিত, যাজক, ফকীর, বিদ্যাসাগর ও তথাকথিত হাদীয়ে জামানের দারস্থ হওয়ার কোনই দরকার নেই আল্লাহর নবীর সাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণ সকলেই আহলে যিক্‌র ছিলেন। তারপর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ , ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাজাহ প্রভৃতি মহামতি ইমামগণ সকলেই আপন আপন যুগে আহলে যিক্‌র ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে হাজার হাজার ছাত্রের উস্‌তায ছিলেন। কিন্তু তারা কোন পীরের কাছে বাতিনী ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুরীদ বানিয়েছিলেন-এ প্রমাণ কোথাও নেই। ঐ সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ী ও মহামতি ইমামগণের কোন খানকা শরীফ ছিলনা। তাঁদের খান্‌কা থাকলে নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)'র খান্‌কার নাম হতো 'খান্‌কা শরীফ সিদ্দিকীয়া। উমার ফারুক

(রাযি.)'র খানকার নাম হতো, খানকা শরীফ ফারুকিয়া।' উসমান (রাযি.)'র খানকার নাম হতো 'খানকা শরীফ উস্‌মানিয়া। আলী মুরতজার খানকার নাম হতো খানকা শরীফ মুর্‌তজায়া। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র খানকার নাম হতো 'খানকা শরীফ হানাফিয়া'। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর খানকার নাম হতো 'খানকা শরীফ বুখারীয়া' ইত্যাদি। কিন্তু এসবের কোন নজির ইতিহাসের পাতায়া নেই।

তবে হ্যাঁ, কুরআন ও সুন্নাত মুতাবেক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য কেউ যদি কোন আহলে যিকরের হাতে হাত দিয়ে 'বায়আত' গ্রহণ করে বা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়– জায়েয আছে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, সব সময় নির্দিষ্ট একজন আহলে যিকরের সমুদয় নির্ধারণকে মেনে চলা চলবে না। কারণ কুরআনে আহলে যিকের শব্দটাকে অনির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্যপদ রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই সব সময় একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের সব কথা মেনে চলাকে ফরয মনে করা কোন মতেই ঠিক না। সাহাবাদের যুগে শরীয়তের মাসলা মাসায়েল যেমন আবু বাকর ও উমরকে (রাযি.) জিজ্ঞেস করা হতো, তেনমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবা (রাযি.) দেরকেও জিজ্ঞেস করা হতো। তাবেয়ীন এবং পরবর্তী ইমামদের যুগেও আহলে যিকরদেরকে জিজ্ঞেস করার নীতি বলবত ছিল। পরবর্তীকালে এ নীতির ব্যতিক্রম ঘটানোর ফলে অখণ্ড মুসলিম সমাজ নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

অনেকে বলেন জামাআতী শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়ার দরকার। কারো তত্ত্বাবধানে থাকলে জামাত যে ঠিক থাকে একথা ঠিক। ইসলামও একথার গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে জামাত থাকবে, তাঁকে আহলে যিক্‌র অর্থাৎ কুরআন হাদীসের বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। শরীয়ত মুতাবেক চলার জন্য সমাজ তার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করবে। আর সমাজও তাঁর বাচনিক কুরআন হাদীসের নির্দেশ শুনে মেনে চলবে। তবে সমাজ যে তাঁর অন্ধ অনুকরণ করবে আস সমাজকেও যে তিনি কলুর বলদের মত করে রাখবেন– তা চলবে না। শরীয়তের ব্যাপারে অন্যান্য আহলে যিক্‌রদেরকে জিজ্ঞেস করার অধিকার সব সময় সমাজের থাকবে। এক কথায়

বলতে গেলে, কোন জামাতের নেতৃত্ব করা পীরগিরি করা নয়, আর কোন লোকের নেতৃত্ব মেনে নেয়া মানে তার মুরীদ হওয়া নয়। পীরতন্ত্র, পুরোহিত তন্ত্র বা গুরুবাদের স্থান পারসিক সমাজে, হিন্দু সমাজে ও খৃষ্ট সমাজে থাকতে পারে কিন্তু ইসলামে এর অস্তিত্ব নেই।

হে আল্লাহ! তুমি এই পীরি-মুরীদির গোলক ধাঁধাঁ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। (আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন)

সমাপ্ত

তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

১। সহীহুল বুখারী [১ম-২য়-৩য়-৪র্থ খণ্ড] [৫ম-৬ষ্ঠ খণ্ড–যন্ত্রস্থ] (সম্পাদনা পরিষদ)
২। প্রগতির স্রোতে ভাসমান নারী ✪ ইসলামী বাল্য শিক্ষা ✪ Tense শেখা অতি সহজ– অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
৩। আমি তো তাওবাহ করতে চাই– মূল ঃ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজাদ
৪। সহীহ নামায ও মাসনূন দু'আ শিক্ষা (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)– মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী
৫। সহীহ নামায শিক্ষা– আল্লামা অবদুল্লাহ ইবনে ফজল
৬। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বনাম আবূ হানীফা ✪ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব বনাম হানাফী মাযহাব ✪ আহলে হাদীস কি ও কেন? ✪ নামাযের বিধানসূচী ও প্রচলিত নামায বনাম রসূলুল্লাহ (স.) -এর নামায– মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
৭। অত্যন্ত উপকারী সকাল সন্ধ্যার তাসবীহ ও দু'আ ✪ দিবা-রাত্রীর সহীহ 'আমল ও মাসনুন দু'আ শিক্ষা ✪ গুনাহ মোচনের দু'আ– মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী
৮। সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত ✪ ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি (মূল ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী)– আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৯। তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া (১ম ও ২য়)– মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোহাম্মদী সালাফী
১০। উল্টা বুঝিল রাম ও সাধু সাবধান ✪ সত্যের আলো ✪ গিরাওয়ালা ব্যাম্বু ✪ পীরতন্ত্রের আজবলীলা– মোহাম্মদ আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)
১১। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়– আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী
১২। তৌহিদের মূল সূত্রাবলী– ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ আবূ হেনা
১৩। আল-কুরআনের অমিয় বাণী ✪ বেহেশতের সরল পথ– সাদ্রুদ্দীন আহমাদ ইবনু আসমতুল্লাহ
১৪। জ্যউল কিরাআত ✪ জ্যউ রফইল ইয়াদাঈন ✪ সংক্ষিপ্ত আহ্কামুল জানায়িয ✪ আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ ✪ কবর মাযার মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না ✪ ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন? ✪ চার মাযহাবের অন্তরালে– অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান
১৫। ইসলামে দানের গুরুত্ব ও ফাযীলাত বনাম কৃপণতার ভয়াবহ পরিণাম ✪ ইসলামী ক্বায়িদাহ (১ম-২য় খণ্ড)– আবূ রিযা মুজীবুর রহমান সালাফী
১৬। সাড়ে তিনশত বৎসরের লৌহ মানব সালমান ফারসী (রাযি.)– মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নাদভী
১৭। তাবলীগ জামাত ও তাবলীগে দ্বীন– অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল গণি এম.এ
১৮। সংক্ষিপ্ত কবীরা গুনাহ– শামসুদ্দীন আয-যাহাবী
১৯। তাকলীদ- হাদীস অমান্য করার ভয়াবহ চক্রান্ত ✪ ইলমে গায়েব ✪ সুন্নাত বনাম বিদ'আত– অধ্যাপক আবদুন নূর সালাফী (রহ.)
২০। মুসলিম রমণী– মূল ঃ আবূ বকর জাবের আল জাযায়েরী ✪ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা– মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু ✪ আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল-আক্বীদাহ আল-ইসলামিয়াহ– মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
২১। সহীহ হাদীসের দুশমন ✪ হাকপন্থী আলিম ও ভেজাল আলিমের পরিচয়-২ – জহুর বিন ওসমান
২২। মহিলাদের স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের বিধান– মূলঃ মুহাঃ বিন সালিহ আল উসাইমিন অনুঃ মুহাঃ ইউসুফ আলী খান
২৩। সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী– সম্পাদনায় ঃ মাওঃ নোমান ও আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৪। যিয়ারাতুল ক্বুবুর– মূল ঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
২৫। আশারায়ে মুবাশ্শারাহ– মূল ঃ কাজী আবুল ফযল হাবীবুর রহমান, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ ফাইযুর রহমান
২৬। বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় ✪ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত ✪ কে বড় লাভবান– আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ
২৭। যঈফ ও জাল হাদীস– মূল ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
২৮। নামায পরিত্যাগকারীর বিধান– মূল ঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন
২৯। ঈমান কী ও তার বিনষ্টের কারণগুলি আপনি জানেন কি ✪ মুসলিমের দু'আ ✪ তাবলীগী নিসা ✪ মাযহাবের স্বরূপ– মুরাদ বিন আমজাদ

এছাড়াও আহলে হাদীস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আলিমদের ইসলামী বই, ওয়াজ ও গানের ক্যাসেট পাওয়া যায়।